বৌদ্ধধর্ম্ম
ও
নববিধান

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ, (এলাহাবাদ)
এম্ এ, এম্ বি, বি সি, (ক্যান্টাব)

Saroda Ghosh Memorial Publication

বৌদ্ধধর্ম্ম ও নববিধান

(Buddhism and Navavidhan)

নববিধানের আলোকে—বৌদ্ধধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহণের প্রয়াস

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্যাখ্যাত ও পরে
ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় প্রকাশিত ছয়টী উপদেশ
(Six Sermons delivered in 1917)

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ, (এলাহাবাদ)
এম্ এ, এম্ বি, বি সি, (ক্যাণ্টাব)

নববিধান বৈজয়ন্তী উপলক্ষে—সারদা ঘোষ স্মৃতিকল্পে
দেরাদুন বিধানমণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত
২৪নং লিটন রোড, দেরাদুন

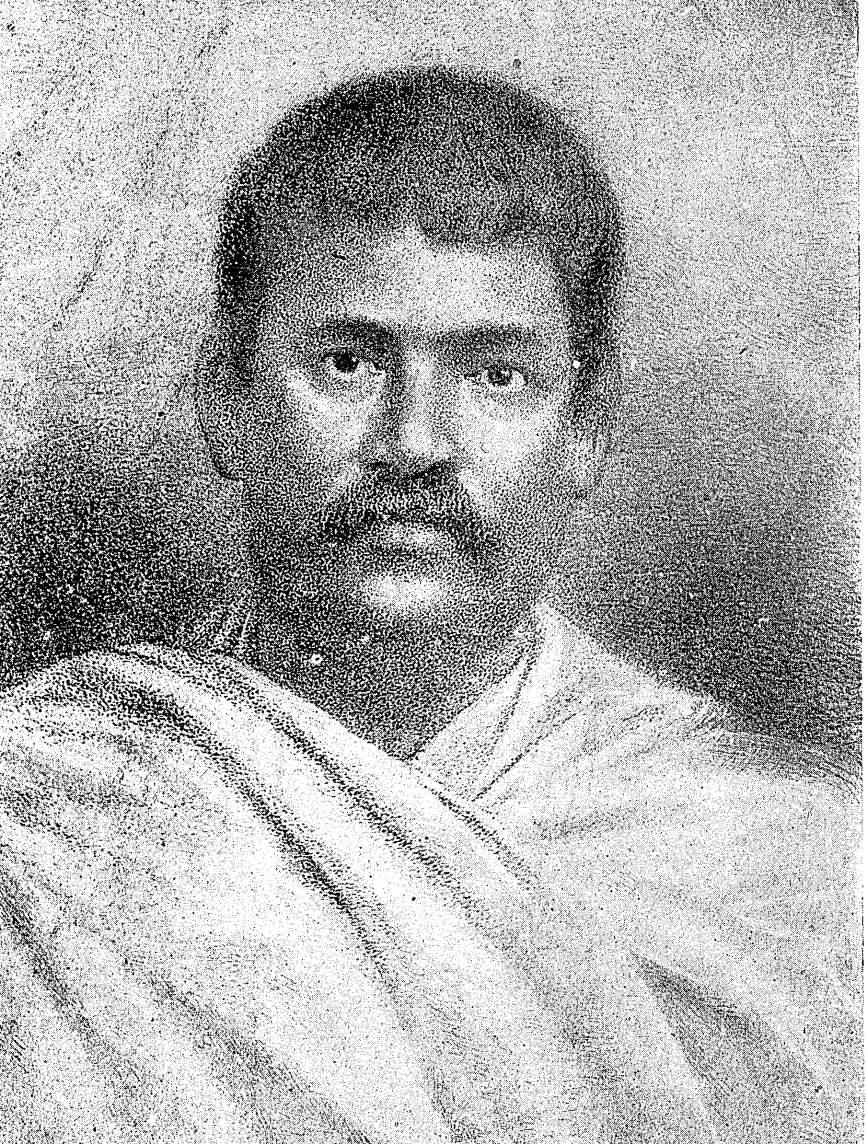
মূল্য ।০ আনা

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে
কলিকাতা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ
নববিধান প্রেসে
বি, এন, মুখার্জ্জি দ্বারা মুদ্রিত

সূচীপত্র

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৫	মরণশীল	সরণশীল
৫	১২	যেখানে	সেখানে
১২	১২	বিবিত্র	বিচিত্র
১৩	২২	থাকিব	থাকি
১৭	৬	এমন	এখন
১৭	৯	কুশিক্ষা	সুশিক্ষা
১৭	১১	প্রক্যেককে	প্রত্যেককে
১৯	১৫	যোগ-মুক্ত	যোগযুক্ত
২০	২২	অহামিকা-	অহমিকা-
২৪	২০	"আধ্যাত্মিক ব্যাপারের" বাদ দিয়া পড়িবেন।	
২৮	৩	bal nced	balanced
২৮	৪	equi ibrium	equilibrium
৩৩	২১	ব াপারই	ব্যাপারই
৩৪	১০	স্বপ্ন	স্বপ্নে
৩৪	১০	conerte	concrete
৩৫	১০	Palable	Parable
৩৬	২	"(irreversibility শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে)" হইবে।	
৩৬	১৫।১৬	ব্যক্তি গঠনের প্রতি প্রেমের গভীরতম	ব্যক্তি বিশেষের প্রতি প্রেমের গভীরতায়
৩৭	১২	ব্রহ্মামন্দিরে	ব্রহ্মমন্দিরে
৩৯	১০	চলিরা	চলিয়া
৪৩	২০	ষোগে	যোগে
৪৬	৪	হ য়াছিল	হইয়াছিল



বৌদ্ধধর্ম্মরত্ন সংগ্রহকারী

—সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত—

জন্ম—১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে, শান্তিপুর নগরে

সম য়াচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের নিকট নববিধান প্রচারব্রত গ্রহণ—১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে,

কলিকাতা নগরে

বৌদ্ধধর্ম্ম ও নববিধান।

বৌদ্ধধর্ম্মের ভাবনা-চতুষ্টয়। *

বুদ্ধদেবের জীবনে যে চারিটি অভিজ্ঞতার কথা বিশেষরূপে উল্লিখিত আছে, সেগুলিকে ভাবনা-চতুষ্টয় বলা হয়।

(১) সকলি ক্ষণিক! সকলি ক্ষণিক (সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং)।

(২) সকলি দুঃখ, সকলি দুঃখ (সর্ব্বং দুঃখং দুঃখং)।

(৩) সকলি স্বলক্ষণ, সকলি স্বলক্ষণ (সর্ব্বং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং)।

(৪) সকলি শূন্য, সকলি শূন্য (সর্ব্বং শূন্যং শূন্যং)।

এই চারিটি মন্ত্রের দ্বারা শিক্ষার্থী বৌদ্ধধর্ম্মের ক্ষণবাদ, দুঃখবাদ, বিশেষত্ববাদ এবং শূন্যবাদ সাধন করিতেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেন। নববিধানের নূতন আলোকে শাক্যসমাগম সাধন করিয়া, আমরাও এই চারিটি মন্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম জানিতে পারিব, শাক্য-বিধানের অপূর্ব্ব রহস্য বুঝিতে পারিব এবং শাক্যজীবনের অপূর্ব্ব লীলা আমাদের কাছে প্রকাশিত হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে বুদ্ধদেবের প্রচারিত সত্য সকল আমরা নূতন এবং পরিচিত ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি। শাক্যমুনির ভাষা

---

* ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, সাপ্তাহিক উপাসনায় ও সেই বৎসরের বুদ্ধোৎসবের উপাসনায় ব্রহ্মমন্দিরে এবং বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভায় বিবৃত এবং ১৮৮০ শকের, ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে পুনর্মুদ্রিত।

বিজ্ঞানের ভাষায় অনুবাদ করিলে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়। যে কথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শতাব্দী ধরিয়া গবেষণার ফলে ধরিতে পারিয়াছেন, সাধকের—যোগীর দিব্য দৃষ্টিতে সে সত্য এক মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইয়াছে। বুদ্ধিবিচার দ্বারা যে রহস্য ভেদ করিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া যায়, দিব্যচক্ষে, বুদ্ধিচক্ষে প্রত্যাদিষ্ট অবস্থায় সে রহস্য এক নিমিষে উন্মুক্ত হইয়া যায়।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিতেন, "যখন প্রত্যাদিষ্ট হই, তখন গাছ কথা কয়, ইন্দুর ছুঁচো স্বর্গের সংবাদ আনে।" শাক্যমুনি যখন বুদ্ধনয়নে জগতের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন, বিশ্বসংসারের বিষয়ে এক নূতন সত্য তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইল; এবং বুদ্ধদৃষ্টিতে যখন জীবকে দেখিলেন, তখন তাঁর হৃদয় অপূর্ব্ব করুণারসে প্লাবিত হইয়া গেল।

সকলি ক্ষণিক।

সংসার যে অসার অনিত্য, একথা আমাদের দেশে অতি পুরাতন। সংসার যে মরণশীল, জগৎ যে গমনশীল, তাহা নামেতেই ব্যক্ত। অন্যান্য দেশেও জীবন প্রবাহ এবং সংসার প্রবাহের কথা সাধারণে প্রচারিত আছে। সকলি ক্ষণিক, মেঘের ন্যায় ক্ষণিক, জলধর-পটলের ন্যায় ক্ষণিক, এই উক্তির ভিতরে তবে নূতন সত্য কি আছে? বুদ্ধদেব জগৎ সংসারকে অনাদি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বলিলেন। গ্রীক্‌দেশীয় ঋষি হেরাক্লাইটাস সমগ্র বিশ্বকে স্রোতের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিলেন যে, এক নদীতে কেহ যেমন দুইবার অবগাহন করে না, কারণ স্রোতের সঙ্গে নিত্য নূতন জলরাশি আসিতেছে, যাইতেছে,

সেই প্রকার জগতে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন অনাদি অবিছিন্ন প্রবাহে চলিয়াছে। জগতের এই গতিশীলতার উপর জোর দিয়া যে সত্য এই দুই ঋষি প্রচার করিতে চাহিয়া ছিলেন, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানে এখন আমাদের কাছেও সুস্পষ্ট হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক জড়তত্ত্ববাদীরা দেখিতেছেন যে, অণুপরমাণুরূপ স্থিতিশীল সূক্ষ্মবস্তুর অনুমান করিয়া প্রাকৃতিক ঘটনার যথোচিত ব্যাখ্যা হয় না। অণু-পরমাণুগুলিকে গতিশীল বলিয়া ধরিলেও উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা হয় না, কারণ অণুপরমাণুগুলি পরস্পর বিছিন্ন, সেই জন্য তাহাদের পরিবর্ত্তে অনাদি অবিছিন্ন শক্তি প্রবাহের কল্পনা (stream of energy) বিজ্ঞানে স্থান পাইয়াছে। সম্মুখস্থ এই আলোকটিও শক্তির প্রবাহ। এক শক্তি-প্রবাহ অন্য শক্তি-প্রবাহে পরিবর্ত্তিত হয় এবং এই পরি-বর্ত্তনই তাহার অস্তিত্ব। এক তাড়িত প্রবাহ ক্রমাগত আলোক-প্রবাহে, শব্দপ্রবাহে, তাপপ্রবাহে, পুনরপি তাড়িতপ্রবাহে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। শক্তিপ্রবাহ বলিলেই শক্তির নিত্য পরিবর্ত্তন মানিতে হয়। বাস্তবিক গতির সঙ্গেই আমরা পরিচিত। প্রকৃত স্থিতির (Absolute rest) সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই। ফলতঃ বিধা-নের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে বৌদ্ধধর্ম্মের ক্ষণবাদকে শক্তিবাদ মাত্রই (Doctrine of energy) বলিতে হয়। সকলি শক্তি সকলি শক্তি।

জগৎ যে শক্তিময়, এই মহান্ সত্য বৌদ্ধশিক্ষার্থীর প্রথম সাধন। বুদ্ধদেবের জীবনে দেখা যায় যে, প্রচারক্ষেত্রে তিনি ক্ষণবাদের সঙ্গে নিয়মবাদ (Law of causation or cosmic order—বিশ্ব সংসারের নিয়মাধীনতা) সংযুক্ত করিতেন এবং এই নিয়মবাদ ভিত্তির উপরে বৌদ্ধধর্ম্মের সমস্ত সাধন প্রতিষ্ঠিত করিতেন। জড় জগতে নিয়ম

দেখিয়া, কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা দেখিয়া তাহাকে হেতুনিয়ম নাম দিলেন। জীবজগতের কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলাকে—জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যুর শৃঙ্খলাকে "বীজনিয়ম" নাম দিলেন। মনোজগতে বৃত্তিগুলির পরস্পর সম্বন্ধকে "চিত্তনিয়ম" নাম দিলেন। মানুষের সামাজিক জীবনে কার্য্যকলাপের শৃঙ্খলা, আচার ব্যবহারের শৃঙ্খলাকে "কর্ম্মনিয়ম" নাম দিলেন। মানুষের লক্ষ্য আদর্শ অবলম্বন করিয়া যেরূপে উন্নত জীবনের, আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ হয়, সেই বিকাশের রীতি ও সাধন-রীতিকে "ধর্ম্মনিয়ম" আখ্যা দিলেন। এই পঞ্চনিয়মের কথা মনে রাখিয়া, জগতে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার প্রাধান্য উপলব্ধি করিয়া, অবিছিন্ন শক্তিপ্রবাহের বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় যে, আজকাল যাহাকে আমরা ক্রমবিকাশ, বিবর্ত্তন, অভিব্যক্তি (evolution) বলি, প্রকৃতই সেই ব্যাপার বুদ্ধদৃষ্টিতে শাক্যমুনির জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। অনাদি অবিচ্ছিন্ন শক্তি-প্রবাহের নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলাময় পূর্ব্বাপর উদ্ভূতি—ইহাই বিবর্ত্তন বা evolution। জগৎ শক্তিময়, জগৎ শৃঙ্খলাময়; জগৎ প্রকাশময়, জগৎ স্বপ্রকাশ; ক্ষণবাদের মূলে এই গভীর সত্যগুলি নিহিত রহিয়াছে।

কলি দুঃখ জরা-মরণ-বিরহ-শোকপূর্ণ সংসারে সকলি দুঃখের কারণ, তাহা মানব মাত্রেরই সুপরিচিত। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা নিত্য প্রত্যক্ষ ব্যাপার, সামাজিক অন্যায় অত্যাচারের পীড়নে এমন লোক নাই যে কখনো ব্যথিত হয় নাই। ক্রোধ-লোভ-মোহ-মাৎসর্য্য-পীড়িত অন্তরে কত ভীষণ সংগ্রাম মানুষকে নিয়ত দগ্ধ করিতেছে। এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া কে না বলিবে, সংসার দুঃখময়? জীবনে যাহাকে সচরাচর সুখ আনন্দ বলা হয়, তাহাও ক্ষণস্থায়ী এবং তাহারও পরিণাম দুঃখ। এই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার

জন্য জীব সদাই ব্যস্ত। যত দেশে যত ধর্ম্ম, যত জ্ঞান বিজ্ঞান স্ফুটিত হইয়াছে, সকলেরই চেষ্টা—সকলেরই প্রয়াস, জীবের দুঃখ-লাঘব, জীবের দুঃখ-মুক্তি। দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া যখন বুদ্ধদেব দুঃখ-মুক্ত হইলেন, তখন জীবকে মুক্তি দিবার জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। জীবের দুঃখ-মুক্তির জন্য তিনি ৫১ বৎসর ধরিয়া নূতন "ধম্ম" প্রচার করিলেন। সে শিক্ষার অর্থ এই, দুঃখ দ্বারা দুঃখ-মুক্তি করা। দুঃখ কি? পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে, বিবর্ত্তনের (evolution) ফলে জীবন-সংগ্রাম (struggle for existence) আছে। সেই জীবন-সংগ্রামের আনুষঙ্গিক ব্যাপার দুঃখ। যেখানে জীবনসংগ্রাম সেখানে দুঃখ। পাশ্চাত্য কবি গেটে (Goethe) দুঃখকে উন্নতির আনুষঙ্গিক কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেখানে উন্নতি, যেখানে Developement, যেখানে দুঃখ। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে দুঃখ উন্নতির পরিচায়ক। তাই দেখি, মহর্ষি ঈশা স্কন্ধে ক্রুশ বহন করিলেন, মস্তকে কণ্টক মুকুট ধারণ করিলেন। দেশ বিদেশে কত সাধু কত সাধ্বী ধর্ম্মের জন্য অগ্নি-কুণ্ডে, ব্যাঘ্রমুখে, জলবক্ষে হাসিতে হাসিতে প্রাণদান করিলেন। দুঃখের সহিত নূতন পরিচয়ে বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ বুঝা যায়। যদি জগৎ evolution of energy হয়, শক্তির বিবর্ত্তন হয়, তবে দুঃখ-ব্যাপারের সহযোগে দেখিলে সেই বিবর্ত্তনকে অভিব্যক্তি, ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি বলিতে হয় (Evolution is development) (The process is a progress)। অনাদি অবিচ্ছিন্ন ভবপ্রবাহের গতি ঊর্দ্ধমুখে। দ্বিতীয় মন্ত্রের মূলে এই নূতন জ্ঞান ও নূতন সত্য।

ক্রমোন্নতির আনুষঙ্গিক দুঃখ, ক্রমোন্নতির সমাপ্তিতে দুঃখমুক্তি। উন্নতির শেষ না হইলে দুঃখের শেষ নাই। অতএব সাধন দ্বারা

শীঘ্র শীঘ্র উন্নতির সোপানে আরোহণ করিলে, বিবর্ত্তনের চরম সীমায় পৌছিলে দুঃখমুক্তি হয়, বাসনার জ্বালা নিবৃত্ত হয়, নবজীবন লাভ হয়, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি হয়, অনন্ত জ্ঞান বস্তুর সঙ্গে যোগ স্থাপিত হয়, অহংজ্ঞান নির্ব্বাপিত হয়।

জগতের নিয়মগুলি অপরিহার্য্য। Evolution এর গতি অনিবার্য্য। জ্ঞানী সুবোধ ব্যক্তি তাই বিবর্ত্তনকে (Evolution) অগ্রাহ্য না করিয়া তাহার স্রোতকে দ্রুতগামী করিয়া দেন। শাক্যসিংহ সাধন করিয়া দেখাইলেন ইহ জীবনে যৌবনেই বিবর্ত্তনের ক্রম-সীমায় উপস্থিত হওয়া যায়। বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির পর তাহার অসারত্ব, ক্ষণিকত্ব, দুঃখানুভূতি অর্থাৎ Evolution আর থাকে না। এই হিসাবে বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ আশার কথা প্রচারিত হইয়াছে। সাধন-বলে জীবন্মুক্তি দেহধারণ করিতে করিতেই মানুষের আশার কথা।

মনুষ্য-জীবনেই দেখা যাইতেছে যে, একাধারেই দেহের বিবর্ত্তন (physical inorganic evolution) প্রাণের বিবর্ত্তন (organic evolution), মনের বিবর্ত্তন (psychic evolution), নৈতিক বিবর্ত্তন (moral evolution) যথানিয়মে চলিয়াছে। দেহ হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম, এই ধারাতে ক্রমবিকাশ হইতেছে। তখন দেহের উপরে প্রাণের প্রাধান্য স্থাপিত হয়, তখন উন্নতির পথে কিছুদূর অগ্রসর হওয়া যায়। যখন প্রাণের উপরে চিত্তের অধিকার বিস্তৃত হয় এবং চিত্তের উপরে কর্ম্মের এবং সেই সকলের উপরে ধর্ম্মের অধিকার ও রাজ্য সুসংস্থাপিত হয়, তখন বিবর্ত্তনের বিরাম হইয়া, ক্ষণিকত্বের ক্ষয় হইয়া, দুঃখের নির্ব্বাণ হইয়া, যে নূতন সৃষ্টি হয়. তাহার বর্ণনা মানুষের ভাষার অতীত, মানুষের বুদ্ধির অগোচর। আবার যতদিন ধর্ম্মের অধিকার, প্রাধান্য, রাজত্ব

প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন মন্দবেগে বিবর্ত্তন চলিতে থাকে। জীবনের পর জীবন ধারণ করিতে হয়। দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব বিবর্ত্তন ক্ষয় কর (end evolution by evolution—by evolving onward)।

সকলি স্বলক্ষণ।

অনাদি অবিচ্ছিন্ন ভবপ্রবাহ যদি শক্তির অভিব্যক্তি হয় ও সেই অভিব্যক্তি যদি ঊর্দ্ধমুখী হয়, যদি বিবর্ত্তন উন্নতি-পরায়ণ হয়, তবে প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন শক্তির উৎপত্তি, নিত্য নূতন সৃষ্টির কথা মানিতে হয়। জগতে প্রত্যেক ঘটনা নূতন, প্রত্যেক ব্যাপার স্বতন্ত্র, প্রত্যেক পদার্থ ও জীব স্বলক্ষণ; কাহারও সহিত কাহারও উপমা হয় না। প্রত্যেকে unique, প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, প্রত্যেকের বিশেষ কার্য্য আছে, প্রত্যেকের বিশেষ কর্ত্তব্য আছে, ধর্ম্ম আছে। একজনের স্থান অন্যে লইতে পারে না, একজনের জীবনের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় অন্যের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রাণিমাত্রেরই জগতে বিশিষ্ট অধিকার আছে। "কর্ম্মনিয়মে" ধর্ম্মনিয়মে হিংসার স্থান নাই, ঈর্ষা ও পরপীড়নের অবকাশ নাই। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।"

কার্য্য-কারণে যখন সাদৃশ্য নাই, তখন ক্রমবিকাশের প্রতিপদে নূতনের আবির্ভাব এবং অভিব্যক্তির প্রত্যেক সোপানে নিত্য নূতন সৃষ্টি। আধুনিক ফরাসী দার্শনিক বার্গসন (Bergson) এই Creative evolution এর কথা বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন। বিবর্ত্তন (Evolution) যতই অগ্রসর হয়, ততই নূতনের আবির্ভাব

স্পষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। জড়জগতে দেখা যায়, যন্ত্রাদি একদিকে চালিত হইয়াও বিপরীতদিকে চালিত হইতে পারে। ঘড়ির কাঁটা ডানদিকে ঘুরাইয়া আবার বামদিকে ঘুরান যায়। কিন্তু উল্টাদিকে ঘুরাইলে ঘড়ির কল শীঘ্র নষ্ট হয়, সে কথাও সকলে জানে। জীব-জগতে জন্ম, বৃদ্ধি, জরা, মৃত্যুর ক্রম উল্টাইয়া দেওয়া যায় না। মৃত্যুর পর যদি জন্ম হয়, তবে সে নূতন জন্ম। চিত্তনিয়মে মনোজগতে দেখা যায় যে, মনের বিকাশ একবার হইলে তাহার পূর্ব্বাবস্থার প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। রোগের আশ্রয় দেহ, বিকারের আশ্রয় মন, সূক্ষ্মরূপে দেখিলে এ দুয়েতেও প্রত্যাবর্ত্তন (reversibility) অতি অল্প বা একেবারেই নয়। নৈতিক জগতে "কর্ম্মনিয়মে" প্রত্যেক কর্ম্ম, ক্রিয়া, আচরণ আপনার প্রভাব বিস্তার করে এবং চরিত্র-গঠনে আপনাপন ফলও উৎপাদন করে। কায়মনোবাক্যের ক্রিয়া-সংযোগে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যখনই চরিত্র পদস্খলিত হয়, তখনই তাহার ভাবী Evolutionএর মাত্রা এবং দুঃখ-ভোগের মাত্রা উভয়ই বাড়িয়া যায়। আধ্যাত্মিক জীবনে "কর্ম্ম-নিয়মের" অধীনতায়, আদর্শের রাজ্যে, চির উন্নতির পথে, নিত্য বিকাশ, নিত্য নূতন সৃষ্টি, নিত্য নূতন দৃষ্টি।

কলি শূন্য শিক্ষার্থীর নিকট সর্ব্বশূন্যবাদটিই বৌদ্ধধর্ম্মের বিষম সমস্যা। "সর্ব্বং শূন্যং" এই কথাতে বৌদ্ধেরা বলেন, বিবর্ত্তমান বিশ্বসংসারে কোন অবিকারী অবিবর্ত্তমান সার বস্তু নাই এবং কোনও জীব বা আত্মা নাই। সাধারণতঃ আমাদের ধারণা এই যে, একটা কিছু আছে, যাহার রূপান্তরে আমরা ক্রমবিকাশ দেখিতেছি। একই মৃৎপিণ্ডকে যেমন বিবিধ আকারের ঘটে পরিণত করা যায়,

বিকারী ঘটের ভিতরে অবিকারী মৃত্তিকা থাকিয়া যায়, বিশ্বসংসারে সে প্রকার কোন অবিকারী পরিবর্ত্তনহীন সার বস্তু আছে, বৌদ্ধেরা তাহা স্বীকার করেন না। অনিত্যের ভিতরে কোন নিত্য বস্তু নাই, পরিবর্ত্তনশীল আবরণের ভিতরে অপরিবর্ত্তনীয় সার বস্তু নাই, খোসার ভিতরে শাঁস নাই। ঘটের ভিতরে জল নাই, ঘট শূন্য। এই অনাদি অনন্ত বিশ্বের উপাদান চির পরিবর্ত্তনশীল এবং সেই উপাদানেই জড়, অজড়, বীজ, চিত্ত, কর্ম্ম, ধর্ম্ম সকলই পাওয়া যাইতেছে। সেই উপাদানকে জড়ও বলা যায় না, চিৎও বলা যায় না, অচিৎও বলা যায় না।

জগতে নিঃসত্ব, নির্জ্জীবতা (no essence or substrate nor any soul)। সকল দেশেই সাধারণ লোকের ধারণা যে, নিজের দেহের ভিতরে যে "আমি" "আত্মা" বলিয়া বস্তু আছে, অন্য সকল জীবদেহের ভিতরেও সেই প্রকার "আমি" "আত্মা" আছে। বালকের নিকট ও অসভ্য জাতিগণের নিকট জড় পদার্থ সকলও এই প্রকারে আমি ও আত্মা পূর্ণ। বৃক্ষের আমি, পর্ব্বতের আমি, সূর্য্যের আমি, নদীর আমি, সাগরের আমি, আমিময় আত্মাময় এই দৃষ্টি (animism) বুদ্ধদেবের অভ্যুত্থান সময়ে বিশেষরূপে জাগরিত ছিল এবং নানাপ্রকারের প্রেতাত্মায় বিশ্বাস সকল সমাজেই ব্যাপ্ত ছিল। সকল দেশেই বিজ্ঞানের (science) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকে এইরূপ প্রেতাত্মায় বিশ্বাসহীন হইয়া যায় এবং প্রাকৃতিক ঘটনায় দেব, দেবীও প্রেতাত্মার প্রভাব দৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া, কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার নিয়মাধীনতার জ্ঞান বাড়িতে থাকে। আমাদের দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের দ্বারা এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বিশেষ ভাবে সূচিত হয়। বৈদিক দেব দেবীগণের পরিবর্ত্তে পঞ্চবিধ জগৎ নিয়মের প্রাধান্য

ঘোষিত হয়। গ্রীকদেশেও দেখা যায়, চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা গ্রীক দেব দেবীর উপরে fateএর অপ্রতিরোধনীয় নিয়মের অধিষ্ঠান মানিতেন।

সাধারণতঃ আমাদের, এমন কি মনোবিজ্ঞানবিদ্গণেরও সংস্কার যে, মানুষের মন, মানুষের আত্মা ছোট কুঠরীর ন্যায় (monads) কিম্বা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায়। বুদ্ধদেব এই বিশ্বাসের প্রতিবাদ করেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলিতে চেষ্টা করিতেছেন, মানুষের মন, মানুষের আত্মা বিরাট। স্মৃতি-তত্ত্বের দ্বারা (memory) বুঝিতে পারা যাইতেছে—যে আমার এখনকার মন, অতীত সকল অবস্থার মনের সমষ্টি অর্থাৎ আমার শৈশবের, আমার বাল্যের, আমার যৌবনের মন সমস্ত একীভূত হইয়া বর্ত্তমানের মনকে সৃষ্টি করিয়াছে এবং অভ্যাস-বলে ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে (psycho analysis) এই সকল পূর্ব্বাবস্থার মনকে স্মৃতিপথে তোলা যায়।

শুধু তাই নয়, মানসিক বিকার যখন ঘটে, তখন বলা যাইতে পারে, যে কোনও একটী পূর্ব্বাবস্থার মন পুনরায় তাহার প্রাধান্য বিস্তার করিতেছে (যেমন বৃদ্ধ বয়সে বালকত্ব আসিয়া পড়ে)। আবার ভবিষ্যতের দিক দিয়া দেখিলে, মনকে নিয়ত বিকাশোন্মুখ, নিয়ত প্রসরণশীল, সঙ্কীর্ণতাত্যাগী (expansive) বলিতে হয়। তৃতীয়তঃ এক আত্মা অপর 'মনের সম্পর্কে যোগাভিলাষী ও যোগ-পরায়ণ, সেই জন্য এক আত্মা অপর আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করে, একজনের চিত্ত অপরের চিত্তকে আকর্ষণ করে, এক আত্মা অন্য অনেক আত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়। সকল আত্মাই যখন বিরাট কিম্বা বিরাটত্ব লাভের দিকে অগ্রসর, তখন আত্মা মাত্রেই

পরস্পর interpenetrative জালতন্তুধর্ম্মী। যখন মহর্ষি ঈশা তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন, "তোমরা আমাতে, আমি তোমাদিগেতে," তখন তিনি এই আত্মার interpenetrationএর কথাই বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরাটমূর্ত্তি পরিগ্রহণ ব্যাপারেও আমরা আত্মার সর্ব্বান্তর্ভাবকতা দেখিতে পাই। প্লেটোর world soul "বিশ্ব আত্মা", গ্রীকদিগের logos, খৃষ্টীয় সমাজের ব্রহ্মসন্তান (son of God), বৈষ্ণবধর্ম্মের পূর্ণাবতার, বুদ্ধদেবের অনন্ত জ্ঞানবস্তু এ সকলের মূলে আত্মার অসঙ্কীর্ণতা ও বিরাটত্বের উপলব্ধি রহিয়াছে বুঝা যায়। যোগযুক্ত আত্মা যে বিরাট, সে কথা আচার্য্য কেশবচন্দ্র উপলব্ধি করিয়া বলিয়া গিয়াছেন. "নববিধানের নূতন মানুষ সেই, যার মস্তকে সক্রেটিস, রসনায় শ্রীগৌরাঙ্গ, বক্ষে শ্রীঈশা, এক বাহুতে শ্রীমহম্মদ, অন্য বাহুতে জন হাওয়ার্ড"—অর্থাৎ নববিধানে নূতন মানুষ যোগযুক্ত প্রসরণশীল আত্মা। "নবদুর্গার নবসন্তান আমি, শত শত চক্ষু, শত শত কর্ণ, শত শত হস্ত, শত শত পদ আমার"—সমগ্র মানবাত্মার সহিত একীভূত যোগযুক্ত কেশবাত্মা আমিত্ববিহীন ব্রহ্মসন্তান ও নবদুর্গার নবসন্তান। তাই তিনি বলিলেন, "একমেবাদ্বিতীয়ং" ছিল স্বর্গে, "একমেবাদ্বিতীয়ং" হ'ল পৃথিবীতে। যোগরহস্য কিছু বুঝিলে, শাক্যদেবের সাধন দ্বারা বুদ্ধত্ব-লাভ কিছু অসম্ভব মনে হয় না। "বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং আকাশবিপুলং সমং" অধ্যাত্মরাজ্যের কথা, সাধনের কথা। একমাত্র অনন্ত জ্ঞান-বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, শাক্যমুনি পিঞ্জরবদ্ধ পাখীর মত ছোট ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেন। এইরূপ ক্ষুদ্র আত্মাকে সাধারণতঃ empiric self বা অহং বলা হয়। যাঁহারা আত্মবাদী, তাঁহারাও সকলে স্বীকার করেন যে, এই অহংজ্ঞান উন্নতির ও মুক্তির বিরোধী। অহংকে উড়াইয়া না দিলে,

আমিত্ব-বিনাশ না হইলে, প্রকৃত আত্মজ্ঞান বা আত্ম-পরিচয় হয় না এবং প্রকৃত আত্মা যে সম্প্রসরণশীল, যোগাভিলাষী এবং আকাশ-বিপুল, তাহার উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধের জ্ঞান বস্তু এক অখণ্ড ও অপরিচ্ছিন্ন সত্তা continuum। সাধারণ আত্মবাদের আত্মা পরিচ্ছিন্ন, খণ্ডাকার (discrete), পরস্পর বহির্ভূত। অবশ্য অনেক আত্মবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, এই খণ্ড সত্তানিচয় যোগবলে সত্তা-সমষ্টিতে পরিণত হইয়া, এক অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন সত্তা লাভ করিতে পারে।

বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মান্তর-বাদ, এই নিরাত্মবাদের জন্য প্রচলিত জন্মান্তরবাদ হইতে কিছু স্বতন্ত্র। কোন আত্মা নাই, কোন সংক্রমণ নাই, অথচ মৃত্যুতেই সব শেষ হয় না। তাঁহাদের পরলোক সম্বন্ধে এই মত অতি সুদৃঢ় এবং নানারূপ আকারের বিচিত্র কল্পনা-পূর্ণ। সুতরাং বলিতে হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মান্তর-বাদ কতকটা Aristotleএর বিশ্বাসের ন্যায় এবং প্রকৃত ভাবে বিবর্ত্তন-বাদ মাত্র। অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিবর্ত্তনের, ক্রমবিকাশের শেষ হয় না, কোন না কোন দেহান্তরে বা রূপান্তরে সেই বিবর্ত্তন চলিতে থাকে। যতদিন না কর্ম্মনিয়মের উপর ধর্ম্মনিয়মের আধিপত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন বিবর্ত্তন চলিবে, ততদিন জন্ম, জরা, মৃত্যুর অধীন থাকিতে হইবে। নির্ব্বাণ-লাভ হইলে, বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি হইলে, আর বিবর্ত্তন চলে না, ক্রমবিকাশের শেষ হয়, জন্ম, জরা মৃত্যু আর ঘটে না। জীব যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে পূর্ব্বপুরুষের মারফত যে শারীরিক ও মানসিক সংস্থান (bodily and mental organization) লইয়া আসে, তাহাকেই অতীতের বিবর্ত্তনের শেষ ধাপ বলা যাইতে পারে।

ইহজীবনে সেই বিবর্ত্তন আরও অগ্রসর হয়। মৃত্যুতে সেই বিবর্ত্তনের শেষ না হইয়া, অন্য কোন অবস্থায় ইহলোকে নূতন পথে বিবর্ত্তন-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। যখন আত্মা নাই, সংক্রমণ নাই, তখন মৃত্যুর পরে ইহজন্মের রাম বা শ্যাম, পর জন্মে ঠিক সেই রাম বা শ্যাম থাকে না। এই জীবনেই যৌবনে চরিত্রের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে, দেহমনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, বালক রাম আর বালক রাম থাকে না। এই জীবনেই আমাদের নিত্য নূতন জীবন লাভ হইতেছে। সুতরাং মৃত্যুর পরে রূপান্তরে নবজন্ম ধারণ করিয়া যে শিশু জন্মগ্রহণ করিল, সে শিশুকে আর রাম বলা যায় না। কারণ যদিচ রামের বিবর্ত্তনের ফল সমস্তই সেই শিশুতে আছে, তথাপি নূতন জন্মে নূতন কিছু তাহাতে যুক্ত হইয়াছে।

বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তনিয়মের এক প্রকার চেতনা-জ্ঞান, কর্ম্মনিয়মের আর এক প্রকার চেতনা-জ্ঞান এবং ধর্ম্ম-নিয়মের উচ্চাবস্থায় আর এক প্রকার চেতনা-জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। দিব্যদৃষ্টি লাভের পূর্ব্বে, নবচেতনা লাভের পূর্ব্বে, আমরা তর্ক যুক্তি অনুমান বুদ্ধি বিচার করিয়া যে জ্ঞান লাভ করি, সেই জ্ঞান অতি অসম্পূর্ণ অল্প জ্ঞান। সে জ্ঞানে আমরা বিশ্বসংসারকে যেরূপ বুঝি, তাহাতে বিশ্বের সঙ্গে অত্যন্ত আংশিক ভাবে পরিচয় হয়। তাহাতে বিশ্বকে খণ্ড করিয়া, ছিন্ন পরিচ্ছিন্ন করিয়া, দেশ কালে আবদ্ধ করিয়া, সীমাবদ্ধ সসীম করিয়া, বিশ্বকে বিপর্য্যস্ত করিয়া খণ্ড জ্ঞানের খণ্ড পরিচয়ে সন্তুষ্ট থাকি। এই খণ্ড জ্ঞান ও খণ্ড পরিচয়কে দূর করিয়া, পূর্ণতর জ্ঞান ও পূর্ণতর পরিচয়ের জন্য, এবং পূর্ণতর জ্ঞান ও পূর্ণতর পরিচয় লাভ করিয়া, লাভের

উপায় ও উদ্দেশ্য জনসমাজে প্রচার করিবার জন্য বুদ্ধাত্মাদিগের আবির্ভাব। দিব্যদৃষ্টি, ঋষিদৃষ্টি, সমগ্রদৃষ্টি (Intuition) বা বুদ্ধদৃষ্টি—এই সকল দৃষ্টিতে পূর্ণতর জ্ঞান, পূর্ণতর পরিচয়, যথার্থ জ্ঞান, যথার্থ পরিচয় ঘটে এবং সেই পরিচয়ের কথা বাস্তবিক মানুষের ভাষায় বর্ণনা হয় না। পরিচয় লাভ না করিলে, সে পরিচয় বুঝা যায় না (যেমন পরের মুখে ঝাল খাওয়া যায় না)। তথাপি বৌদ্ধধর্ম্মের এই ভাবনা-চতুষ্টয় আলোচনার দ্বারা জানা যায় যে, বুদ্ধদেব যথাসম্ভব সেই পরিচয়ের কথা তখনকার ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই পরিচয়ের উপায় নিজ জীবনে সাধন করিয়া, বিবিধ অঙ্গের সাধনপ্রণালী তাঁহার সমাজে রাখিয়া গিয়াছেন। বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জ্ঞান নূতন চেতনার উন্মেষ হয়। অতএব সাধন দ্বারা বিবর্ত্তনের পথে শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইলে, বিবর্ত্তনের সীমান্ত স্থানে নির্ব্বাণে উপস্থিত হওয়া যায়। সেখানে সমগ্র দর্শন, পূর্ণদৃষ্টি, বুদ্ধদৃষ্টি।

ধর্ম্মনিয়মে প্রেমের প্রাধান্য।

বুদ্ধদেব প্রথম জীবনে তখনকার প্রচলিত ধর্ম্মে অসন্তুষ্ট হইয়া, বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিবাদ-স্বরূপ যখন নূতন সাধন ও নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্ম আপাতদৃষ্টিতে প্রচলিত ধর্ম্ম-সমূহের বিরোধী ছিল ; পরে তাঁহার ধর্ম্ম "সর্ব্বধর্ম্ম-নির্ব্বিরোধ" বলিয়া প্রচারিত হইল। বাস্তবিক বুদ্ধদেব প্রচলিত ধর্ম্মগুলিকে আত্মস্থ করিয়া, তাঁহার ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই সমন্বয়ের কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম শত সহস্র নরনারীর নিকট আদরণীয় হইয়াছিল। এখন নববিধানের মহাসমন্বয়ে বেদ বেদান্তের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের ও

তাহাদের সঙ্গে খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের মহাসমন্বয়ে, সর্ব্বধর্ম্ম-নির্ব্বিরোধ কথার গভীর মর্ম্ম আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। নববিধানের আশীর্ব্বাদে আমরা এখন বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বগুলি বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছি। কথিত আছে, রাত্রির প্রথম যামে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া, বুদ্ধদেব দ্বিতীয় যামে আপনাকে বোধিসত্ত্বগণের বংশধর বলিয়া জানিলেন এবং শেষ যামে "প্রধান পুরুষত্ব" লাভ করেন। নির্ব্বাণ-লাভের সময় তাঁর হৃদয়ে অপূর্ব্ব করুণারস সঞ্চারিত হয় এবং তিনি বুদ্ধদৃষ্টিতে জীবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদের দুঃখ-মোচনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। তখন নির্ব্বাণের অবস্থা ঠিক করিয়া, অনর্থযোগ-সমাধি ত্যাগ করিয়া, লোকের দুঃখমুক্তির জন্য পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিয়া, ৫০ বৎসর ধরিয়া প্রচারে জীবন ক্ষয় করিলেন। যিনি জগতের সকলই দুঃখময় দেখিলেন, প্রত্যেক মানুষকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে দেখিলেন, যিনি পবিত্রতা ও পুণ্যশাসনের উপরে সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন, যিনি অনন্ত জ্ঞান-বস্তু ভিন্ন অন্য কাহারো অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন না, তিনিই কাতরপ্রাণ হইয়া দুঃখময় জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য, নীতির কঠোর শাসন, নিয়মের কঠিন শৃঙ্খল, দয়া সাধন দ্বারা অপসারিত করিলেন। যিনি প্রজ্ঞাচক্ষে, দিব্যচক্ষে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ম-পরিচালিত নিয়ম-শাসিত দেখিলেন, তাঁহার হৃদয় করুণারসে প্লাবিত হওয়াতে, তিনি কি সেই নিয়ম, সেই শাসন লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইলেন? জড় জগতের হেতু-নিয়ম, প্রাণী জগতের বীজনিয়ম, মনোজগতের চিত্তনিয়ম, নৈতিকজগতের কর্ম্মনিয়ম, ধর্ম্মনিয়ম এই সকল অপরিহার্য্য অনতিক্রমণীয় নিয়মকে তিনি কি অবজ্ঞা করিয়া অগ্রাহ্য করিতে বসিলেন? নববিধানের

আলোকে এই সমস্যা খণ্ডন অতি সহজেই হয়। সর্ব্বোচ্চ নিয়ম ধর্ম্মনিয়ম। জগতে, সংসারে ন্যায়ের রাজ্য—ন্যায়ের শাসন। ধর্ম্ম দ্বারা, ন্যায় দ্বারা বিশ্ব-সংসার বিধৃত (Justice sustains the universe.) এই ধর্ম্মের শাসন, ন্যায়ের শাসন অখণ্ডনীয়। তবে করুণার, দয়ার, প্রেমের স্থান কোথায়? নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেবের প্রাণে অপূর্ব্ব করুণার সঞ্চার হইল। তখন বুদ্ধদেব নূতন সত্য, নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন—যে প্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিয়ম। প্রেমই সকল নিয়মের, সকল ন্যায় বিচারের, সকল ধর্ম্মশাসনের পরাকাষ্ঠা।

এই অনুভূতি, অভিজ্ঞতা অল্পে অল্পে পণ্ডিতগণের, সমাজতত্ত্ব-বিদ্গণের নিকট প্রকাশিত হইতেছে। যে সত্য এক রাত্রে বুদ্ধদেবের নিকট বুদ্ধদৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিল—সেই সত্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আলোচনা, তর্ক বিতর্ক করিয়া পণ্ডিতেরা লইতেছেন। মনুষ্যসমাজে অপরাধতত্ত্বে (crime and criminality) দণ্ডনীতির, ন্যায়-বিচারের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহারা দেখিতেছেন যে, প্রথম অসভ্য সমাজের, এমন কি অনেক অবস্থায় সুসভ্য সমাজের, ন্যায়-বিচার "প্রতিশোধ প্রতিহিংসা"র উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু, দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত, প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রাণ নষ্ট করা হইত। বংশপরম্পরা ধরিয়া এই প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা ব্যাপার চলিত। তার পর যখন বিবাদ, বিসম্বাদ, বংশকলহে সমাজ জর্জ্জরিত হইয়া, বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে লাগিল, তখন দণ্ডনীতিতে তারতম্যের প্রবর্ত্তনা হইল। শারীরিক দণ্ডের পরিবর্ত্তে কারাবাস, ক্রীতদাসত্ব বা অর্থদণ্ড দিয়া সমাজকে প্রসন্ন করা—এই সকল রীতির প্রবর্ত্তনা হইল। তখন ক্রমে ক্রমে তুলাদণ্ডে ধরিয়া ওজন করার ন্যায়,

অপরাধ ও তাহার শাস্তির বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত হইতে লাগিল। ক্রমে অপরাধীর বিচার ও শাস্তির নির্দ্ধারণ করিতে করিতে দেখা গেল যে, অনেক অপরাধ (crime) রোগ মাত্র এবং অপরাধী রোগ-গ্রস্ত রোগী। তাই রোগের চিকিৎসার জন্য যেমন হাঁসপাতাল, তেমনি কয়েদীদের জন্য জেলখানা আশ্রয়, আশ্রমে পরিণত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইল। আবার এমন অনেক সমাজতত্ত্ববিদের নিকট নূতন সত্য প্রকাশিত হইতেছে যে, বাস্তবিক অপরাধীরা যদি রোগ-গ্রস্ত, তবে সে রোগের মূল সমাজের কুশিক্ষা, কুপ্রথা, অন্যায়, অবিচার, দৌরাত্ম্য ইত্যাদি। তাই তাঁহারা বলিতেছেন যে, কুশিক্ষা বিস্তার করিয়া, স্বপ্রথা স্বরীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া, দারিদ্র্য, অনাহার দূর করিয়া, প্রত্যেককে জীবনধারণে স্বযোগ স্ববিধা দান করিয়া, অপরাধের পরিমাণ ও অপরাধীর সংখ্যা হ্রাস করা যাইতে পারে। অর্থাৎ সমাজে, দেশে, রাজ্যে, সাম্রাজ্যে প্রেমের শাসন প্রচলিত করিলে ধর্ম্মনিয়মের অধীন হওয়া যায় এবং লোকের দুঃখ-মুক্তি হয়। যে শাসনে প্রেম নাই, সে শাসন নিম্নশ্রেণীর শাসন। হেতুনিয়মে শক্তির শাসন। বীজনিয়মে প্রাণশক্তির শাসন। চিত্তনিয়মে জ্ঞানের শাসন। কর্ম্মনিয়মে পুণ্যের শাসন। ধর্ম্মনিয়মে প্রেমের শাসন। তাই ঈশাও বলিয়াছিলেন, love is the fulfilment of the law. প্রেমই শাসনের পরাকাষ্ঠা। সংসারে সর্ব্বোচ্চ সত্য, সর্ব্বপ্রধান শক্তি কি? প্রেম। গভীরতম, গূঢ়তম সত্য কি? শক্তি কি? প্রেম। সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান কি? গভীরতম অভিজ্ঞতা কি? প্রেম। সর্ব্বোচ্চ লীলা, গভীরতম গূঢ়তম লীলা কিসের? প্রেমের। সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল, গূঢ়তম গভীরতম কল্যাণ কি? প্রেম। সর্ব্বোচ্চ একতা, গূঢ়তম গভীরতম একতা কোথায়? প্রেমে। সর্ব্বোচ্চ শাসন,

গূঢ়তম গভীরতম ন্যায়-বিচার কোথায়? প্রেমের অধীনতায়। সর্ব্বোচ্চ আনন্দ কি ? গূঢ়তম গভীরতম আনন্দ, শান্তি, যোগ কখন ? প্রেম-বিহ্বলতায়।

কর্ম্মনিয়মে পুণ্যের প্রাধান্য।

নববিধানের চাবি দিয়ে সকল ধর্ম্মের তত্ত্ব খোলা যায়। নব-বিধান দিয়ে শ্রীভগবান্ আমাদিগকে কত রত্নের অধিকারী করে-ছেন। প্রাচীন গ্রীকেরা জগতে নিয়মের প্রাধান্য দেখেছিলেন। জগতে কার্য্যকারণের প্রচলন দেখে, Fate 'ভাগ্য' আছে বলে মেনেছিলেন। সব দেব দেবীদের উপরে সেই ভাগ্যের কর্ত্তৃত্ব আছে, স্বীকার করতেন। এই কার্য্যকারণের কর্ত্তৃত্ব ছাড়া তাঁরা বিশ্বনিয়মে উচ্চতর গভীরতর নিয়ম দেখে, তাকে "Harmony" সঙ্গীতনিয়ম নাম দিয়াছিলেন। আবার প্রকৃতিতে এবং জীবজন্তুর ও নরনারীর দেহাবয়বের সৌন্দর্য্য দেখে সৌন্দর্য্যনিয়মের কথা বলতেন. আর সাধন করতেন। তাই তাঁদের দেশে কত শিল্পকলা, চারুকলার সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা আরো বলতেন যে, এই সংগীত আর সৌন্দর্য্যনিয়মের ভিতর দিয়ে ব্যহ্যজগতে আধ্যাত্মিক জগৎ প্রকাশিত হচ্চে। রূপসৌন্দর্য্য আর শব্দমাধুর্য্য অনুভব করে, উচ্চতর নিয়মের অস্তিত্ব ও প্রকাশ তাঁরা স্বীকার করেছিলেন। সেই উচ্চতর নিয়মের অধীন হয়ে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ উপগ্রহ সকলে আকাশে বিচরণ করে, আর রূপসৌন্দর্য্য ও শব্দমাধুর্য্যে বিশ্বকে পূর্ণ করে দেয়। আমাদের দেশেও বেদ বেদান্তের সময় প্রকৃতি যে সামগান ক'রে নানা ছন্দে বিশ্বদেবের স্তব করছে, ঋষিরা তা

বিশ্বাস করতেন। ঋষিদৃষ্টিতেও কার্য্যকারণ নিয়মের উপর অন্য নিয়মের অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম্মে আবার বিশ্বনিয়মের কথা বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। জড়জগতে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলাকে শাক্যমুনি হেতু নিয়ম নাম দিয়া, প্রাণিজগতে জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যুর শৃঙ্খলাকে বীজনিয়ম নাম দিয়া, তাদের উপরে মনোজগতের "চিত্তনিয়ম" আর নৈতিকজগতের "কৰ্ম্মনিয়মকে" অধিষ্ঠিত দেখলেন। আর সকলের উপরে "ধৰ্ম্মনিয়ম" আছে স্বীকার করলেন। ধৰ্ম্মনিয়মে নূতন আদর্শ নূতন জীবন লাভ হয়। ধৰ্ম্মনিয়মে নূতন চরিত্র, নূতন type, নূতন জীবসৃষ্টি হয়। ধৰ্ম্মনিয়মে প্রেমেরই প্রাধান্য। প্রেমের রীতিই আত্মত্যাগ, আত্মদান। ধৰ্ম্মনিয়মে তাই আত্মপর থাকেনা, সমস্ত সংসারের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে প্রত্যেক আত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বমানব হয়ে যায়। তখন নিজ-পর আত্ম-পরদৃষ্টি, আমি তুমি, আমি কে, এ সকলের নির্ব্বাণ হয়। শাক্যমুনি এই অবস্থায় উন্নত হয়ে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হলেন, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হলেন। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে যোগ-যুক্ত হয়ে এক হয়ে গেলেন।

ধৰ্ম্মনিয়মের অধীন বা অন্তর্গত কৰ্ম্মনিয়ম আছে। যে যা করে—কায়মনোবাক্য দিয়া করে, সে সেই রকম ফল পায়—আর সেই রকম চরিত্র পায়—সেই রকম হয়ে যায়। কৰ্ম্ম দিয়ে চরিত্র গঠন হয়। শাক্যমুনি সমাধিযোগে ধ্যানবলে জানেন যে, 'আত্মা' নাই, কিন্তু চরিত্র আছে। সে সময়ে আত্মার বিষয়ে যে ধারণা প্রচলিত ছিল, সেই ধারণায় আত্মাকে স্থিতিশীল, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার, পরিবর্ত্তনহীন, অনুন্নতিশীল (static unity) বলিয়া মনে করা হইত। ক্ষণিকত্ব-বিশ্বাসী, energy বিশ্বাসী বুদ্ধদেব তাই 'আত্মার' অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেন, আর তাহার স্থানে গতিশীল, সকৰ্ম্ম, বিবর্ত্তমান,

ক্রমবিকাশাধীন, চির উন্নতিশীল (dynamic unity) চরিত্রকে বসাইলেন। কর্ম্মনিয়মে চরিত্রের বিকাশ, চরিত্রের আধিপত্য, পুণ্যের প্রাধান্য।

আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে, পুণ্য করিলে আত্মসংযম ত করিতেই হয়, আত্মত্যাগও করিতে হয়, অহংকে ভুলিতে হয়। তাহা না করিলে পুণ্যসাধন হয় না। দানের মাহাত্ম্য আমাদের দেশে বিশেষ ভাবে পরিচিত ও কীর্ত্তিত। দান ও পুণ্য প্রায় পরস্পরের প্রতিশব্দের মত। এই দানের বিষয় বুদ্ধদেব বলিতেছেন যে, দানের সময় দাতা নিজেকে ভুলিবেন, নিজেকে নিরাত্ম জানিবেন, দানের পাত্রকেও নিরাত্ম দেখিবেন, পাত্রাপাত্র ভেদ করিবেন না এবং দান-কার্য্যেও অভিপ্রায় অভিসন্ধি উদ্দেশ্য প্রকারভেদ রাখিবেন না। দান যখন এইরূপে নৈরাত্ম্য হয়, তখনই দান পুণ্যকার্য্য হয়। দানের জন্য দান, Virtue is its own reward এই জ্ঞান—দান-কার্য্যই ধর্ম্মাচরণ—দান করিবার সময় আত্মবিস্মৃতি—দানের পাত্রের গুণাগুণ-বিচার-বিরতি—এই সকল দ্বারাই দান নৈরাত্ম্য হয়। নৈরাত্ম্য দানই পুণ্যকর্ম্ম—চরিত্র-গঠনের, চরিত্র-বিকাশের কারণ ও সহায়। সকল ধর্ম্মাচরণ বিষয়েই এ কথাগুলি প্রয়োগ হইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মাচরণ অহেতুক না হইলে, spontaneous না হইলে, ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মাচরণ না হইলে—বাস্তবিক ধর্ম্মাচরণ হয় না, অধর্ম্মাচরণে পরিণত হয়, prudence policy হইয়া যায়। আধ্যাত্মিক যা কিছু ব্যাপার, এই ভাবে দেখিলে সকলই নৈরাত্ম্য, সকলই অহংবিরোধী, অহামিকা-শূন্য, আত্মত্যাগ-প্রধান। আত্মত্যাগ, আত্মনাশই যদি কর্ত্তব্য এবং সম্ভব, তবে গভীর দৃষ্টিতে বলা যায় যে, কর্ম্মনিয়মের রাজ্যে বাস্তবিক

আত্মা নাই। যদি কিছু থাকে, তাহা চরিত্র। শাশ্বত বস্তু কিছুই নাই, নির্ব্বিকার পরিবর্ত্তনহীন বস্তু কিছু নাই।

এ সম্বন্ধে আর একটী কথা মনে রাখা প্রয়োজন। উচ্চতর জীবনের কাছে নিম্নাবস্থার জীবন বিশৃঙ্খল, নিয়মহীন মনে হয়, অস্থির, চঞ্চল, অনিত্য হইয়া যায়। উচ্চতর নিয়মের রাজ্যের সম্পর্কে বা তুলনায় হীন নিয়মের রাজ্য বিশৃঙ্খল, অরাজক, অনিয়ন্ত্রিত, অস্থায়ী unstable দেখায়। কর্ম্মনিয়মের রাজ্য সেইরূপ অস্থায়ী, চঞ্চল, অনিত্য। তাই কর্ম্মনিয়মের রাজ্যে চরিত্রের উদ্ভূতি সত্ত্বেও চরিত্রের পরিবর্ত্তনের জন্য, চরিত্রের উন্নতি হইতে থাকায়, আমরা বলিতে পারি যে, কর্ম্মনিয়মবদ্ধ জীবন মুক্তিলাভ করে নাই। ধর্ম্মনিয়মের প্রাদুর্ভাবে স্থির, ধীর, নিশ্চল সত্তা বা স্থায়ী শাশ্বত জীবন বা জীবন্মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ হয়। এখানে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একটী কথা মনে আসিতেছে। স্বপ্ন-রাজ্যের বিশৃঙ্খলা, নিয়মহীনতার কথা সকলেই বেশ জানেন। অথচ স্বপ্নের ভিতরেও নিয়মাধীনতা আছে। স্বপ্নেও শৃঙ্খলা পাওয়া যায়। জাগ্রত অবস্থার তুলনায় স্বপ্নের অবস্থা অলীক ও অনিত্য। কিন্তু যতক্ষণ স্বপ্ন থাকে, ততক্ষণ স্বপ্ন সত্য। জাগ্রত অবস্থার তুলনায় স্বপ্ন নিয়মহীন ও বিশৃঙ্খল, কিন্তু স্বপ্নের ভিতর নিয়ম ও শৃঙ্খলা আছে। যেমন স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টাই কর্ত্তা নায়ক hero, স্বপ্নের ভিতর সকর্ম্ম ক্রিয়াশীল ব্যক্তি বা ব্যাপার স্বপ্নদ্রষ্টা ছাড়া আর কেহ নয়। তাই স্বপ্ন অহমিকার রাজ্য, আত্মগরিমার দেশ, আত্ম অনুভূতির, আত্মকর্ত্তৃত্বের বিস্তৃত ক্ষেত্র বলিতে পারা যায়। স্বপ্ন আবার বাসনাময় এবং দ্রষ্টার বাসনা-পরিতৃপ্তির দৃশ্য। আমাদের যে সকল প্রবল বাসনা জাগ্রত অবস্থায় পূর্ণ হয় না, স্বপ্নে সে সকলকে অনায়াসে

পরিতৃপ্তি লাভ করিতে দেখা যায়। স্বপ্নের বিষয়ে এই কথাগুলি মনে রাখিলে বুঝা যায় যে, বাসনাতৃপ্তির স্থল, আত্মকর্ত্তৃত্বের অহমিকার ক্ষেত্র স্বপ্নরাজ্য যেমন জাগ্রদবস্থার তুলনায় অস্থায়ী অসার অনিত্য—আমাদের ইহলোকের সাংসারিক জীবন—অহংজ্ঞানপূর্ণ বাসনাতৃপ্তির চেষ্টায় মগ্ন. পার্থিবজীবনও তেমনি নির্ব্বাণজীবনের, বুদ্ধত্ব-প্রাপ্ত জীবনের তুলনায় অস্থায়ী অসার অনিত্য। স্বপ্ন কাটিয়া গেলে যেমন আমরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হই এবং গভীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি, তদ্রূপ পার্থিবজীবন কাটিয়া নির্ব্বাণের জীবন লাভ হইলে, আমরা এক অনন্ত পরিশুদ্ধ জ্ঞানসত্তায় ডুবিয়া যাই। আধ্যাত্মিক ভাবে বলিতে পারা যায় যে, যেখানে কর্ত্তৃত্ব, সেইখানে স্বপ্নরাজ্য। যে জীবনে আমি কর্ত্তা, সে জীবন নীচ, নিয়মহীন জীবন—সে জীবন অস্থায়ী, অস্থির, অনিত্য। যে পরিবারে আমি কর্ত্তৃত্ব করি—যে সমাজ আমি চালাইতে চাই—সে পরিবার, সে রাজ্য ততই বিশৃঙ্খল, অনিয়ন্ত্রিত, অরাজক হইয়া উঠে। যে জীবন, যে সমাজ, যে পরিবার, যে দেশ ন্যায়ধর্ম্মশাসিত, পুণ্যপ্রেম-শাসিত, সে জীবন, সে সমাজ, সে পরিবার, সে দেশ স্থির, ধীর, স্থায়ী, নিত্য, আনন্দশান্তিপূর্ণ হইয়া যায়। তাই নববিধানের শিক্ষা এই যে, আত্মতন্ত্র দূর করিয়া সকল স্থানে সর্ব্বতোভাবে ঈশতন্ত্র স্থাপন করিতে হইবে। সকল ব্যাপারে ঈশ্বরের আদেশ চাহিতে হইবে, শুনিতে হইবে, পালন করিতে হইবে। আত্মতন্ত্রের রাজ্য স্বপ্নের মত একদিন ভাঙ্গিয়া যায়।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র আরো গভীর কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, যতক্ষণ মানুষ পাপী, ততক্ষণ সে কর্ত্তা। যতক্ষণ আমি কর্ত্তা, ততক্ষণ আমি পাপী। যখন ভগবান্ কর্ত্তা হন,

জীবনে, প্রাণে, তখন সকল কার্য্যই পুণ্য। লোকে যাহাকে সৎকার্য্য, হিতকার্য্য, মঙ্গলকার্য্য বলে, নববিধানের কাছে তাহাও পুণ্য নয়, যদি না ভগবৎ আদেশ বলিয়া সেই কর্ম্ম করা হয়। দামোদরের বন্যায় দুর্ভিক্ষের দেশে হিতকর্ম্ম করিলেও পুণ্য হইল না, যদি ঈশ্বরের আদেশ না বলিয়া, আদেশ না লইয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। কল্যাণ, অকল্যাণ, মঙ্গল, অমঙ্গল এসব ভেদ আর থাকে না, তখন ঈশ্বরের আদেশের কথা প্রকৃত পুণ্যসাধনের কথা উঠে। তখন ভক্তের ন্যায় বলিতে হয়, সকলই "রামের ইচ্ছা"। ঘর পড়িয়া গেল, সন্তানের মৃত্যু হইল, সন্তান জন্মিল, বৃষ্টিতে ভূমি শস্যশালিনী হইল, সবই বিধাতার ইচ্ছা, "রামের ইচ্ছা"। পাপ পুণ্যের প্রভেদ বিধাতার ইচ্ছা, ঈশ্বরের আদেশ। পুণ্য এবং মঙ্গলের এই যে গভীর সম্বন্ধ, নববিধানে সুপ্রকাশিত বুদ্ধদেবও তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। চরিত্রের উন্মেষ ও বিকাশের রীতিকে তিনি কর্ম্মনিয়ম নাম দিলেন। সেই কর্ম্মনিয়মে পুণ্যের প্রাধান্য দেখিলেন এবং পুণ্যের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য নানাবিধ সাধনের প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং পুণ্যেতেই মঙ্গল বিশেষরূপে উপলব্ধি করিলেন।

বুদ্ধদেব আরো বলিতেন যে, যতদিন কর্ম্মনিয়মের অধীন থাকা যায়, ততদিন জন্মজন্মান্তর ঘটিতে থাকে। অর্থাৎ যতদিন চরিত্র গঠিত হইতে থাকে, ততদিন নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ হয় না। জীব কি? মানুষ কি? মানুষ দেহমাত্র নয়, মন প্রাণ নয়, পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায়, দেহ মন প্রাণ বেষ্টিত "আত্মা" বা "অহম্" নয়। অপরন্তু; মানুষ দেহ মন প্রাণ আত্মা বা অহংবিশিষ্ট চরিত্র। তাই যতদিন চরিত্র অসম্পূর্ণ থাকে, গঠিত হইতে থাকে, ততদিন দেহ চাই;

মন চাই, প্রাণ চাই, অহং চাই। যখন এ দেহ না থাকে, অন্য দেহ আসে, তখন এ মন প্রাণের বিবর্ত্তনে অন্য মন প্রাণ আসে, এ আত্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইয়া অন্য আত্মজ্ঞান হয়, এবং ফলে চরিত্রের বিবর্ত্তন হয়। মৃত্যুর পর দেহ নষ্ট হয়, মন, প্রাণ, অহং অদৃশ্য হয়, কিন্তু চরিত্ররূপে থাকিয়া যায় এবং অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া গঠিত হইতে থাকে। "আত্মা" নাই এবং আত্মার "সংক্রমণ" নাই অর্থাৎ পাখীর মত এক পিঞ্জর হইতে অন্য পিঞ্জরে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করে না। এ বিষয়ে উদাহরণ দিতে হইলে, পতঙ্গ জীবনের ডিম্ব, গুটিপোকা (Chrysalis) এবং পক্ষযুক্ত প্রজাপতি এই অবস্থাত্রয়ের উদাহরণ কতকটা দেওয়া যায়। বিবর্ত্তমান চরিত্র নূতন দেহ গড়িয়া লয়, নূতন মন প্রাণ, অহং সৃজন করিয়া লয়। ডিম্ব, গুটিপোকা, পতঙ্গ যেমন এক Series "সম্তান", তেমনি জন্মজন্মান্তর যতদিন চলিতে থাকে, সেই জন্মনিচয়ও এক Series "সম্তান" বা "সম্ততি"।

দেহের "সম্তান" Series (যেমন পিতা পুত্রের) আর চরিত্রের "সম্তান" Series এক নহে। সেই জন্য শাক্যসিংহ পিতা শুদ্ধোদনকে বলিলেন যে, তিনি বুদ্ধগণের বংশধর, বুদ্ধগণের মানস-পুত্র। শাক্যমুনির জন্মান্তর-বাদ সম্বন্ধে যে সকল ধারণা ছিল, তাহা এখনও আমরা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, শাক্যমুনি ~~আধ্যাত্মিক ব্যাপারের~~ প্রচলিত জন্মান্তরবাদকে গ্রহণ করিয়া, তাহার সহিত আধ্যাত্মিক ব্যাপারের চরিত্র-বিকাশের সংযোগ ঘটাইয়া, তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছেন। শুধু তাই নয়, ইহজীবনেই যে পুনর্জন্ম হইতে মুক্তি-লাভ করা যায় এবং পুনর্জন্ম যতদিন হয়, ততদিন দুঃখমুক্তি হয় না,

অতএব পুনর্জন্ম স্পৃহনীয় নহে, এই কথার উপর জোর দিয়া তিনি জন্মান্তরবাদের প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তাকেও দূর না করুন, নিম্নস্তরে নামাইয়া দিয়াছেন। জন্মান্তরে চরিত্রই পুনরাবির্ভূত হয়, চরিত্রের উন্মেষের জন্যই জন্মান্তর, অথচ এই জীবনেই ধর্ম্মনিয়মের অধীনে চরিত্র পূর্ণভাবে গঠিত হইয়া বুদ্ধত্বলাভ হইতে পারে। এই শিক্ষাদ্বারা চরিত্রের প্রাধান্য ও তাহার চরম উৎকর্ষ-সাধনের প্রয়োজনীয়তাকেই বিশেষ স্থান দেওয়া হইল। শিষ্যেরা এবং জিজ্ঞাসু অনেক ব্যক্তি জন্মান্তরের কথা জানিতে চাহিত, কিন্তু তিনি সেগুলিকে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। কেন না ধর্ম্মসাধনে, ধর্ম্ম-আচরণে কোন প্রকার হেতু বা অভিসন্ধি বা অভিপ্রায় লইয়া প্রবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মই হয় না। সুতরাং সাধনের পক্ষে ঐ সকল কথা অপ্রাসঙ্গিক এবং অনিষ্টকর।

চরিত্রের প্রাধান্য স্বীকার করাতে বুদ্ধদেব একেবারে যে নিরাত্মবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। এ বিষয়ে যোগিবর সাধু অঘোরনাথের কথাই ঠিক। অর্থাৎ আমরা যাহাকে "অহং" "অহমিকা" বলি, সাধারণ জ্ঞান বা চেতনায় যাহাকে "আমি" বলি, স্বতন্ত্র ইচ্ছার উৎস বা কেন্দ্রস্বরূপ যে "আমার আমিত্ব"—আমার "অসার স্বামিত্ব," বুদ্ধদেব তাহাকেই "আত্মা" নাম দিয়া, তাহারই বাস্তব অস্তিত্ব, তাহারই শাশ্বত অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। যখন "আমিত্ব"কে দূর করা সাধনের উদ্দেশ্য, যখন "আমিত্ব"কে দূর করাই প্রেমের রীতি, পুণ্যসাধনেরও test বা লক্ষণ—যখন আমিত্বকে অপসারিত করা যায়, নাশ করা যায়, তখন আমিত্ব যে একটা ক্ষণস্থায়ী অনিত্য ব্যাপার মাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। সাধু অঘোর নাথের মত গ্রহণ না করিলে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে মত দিয়া বলিতে

হইবেই হইবে যে, শাক্যমুনি আত্মাকে অস্বীকার করিয়াও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন বা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং "সর্ব্বোচ্চ" উপাধি লাভ করিয়াও আত্মা সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে পারেন নাই। আমাদের মনে হয় যে, আত্মাকে 'Static unity' বলিয়া ধরিলে, পরিবর্ত্তনহীন শাশ্বত সত্তা বলিয়া বুঝিলে, তাহাকে "অহম্" বলাই যুক্তিযুক্ত; কারণ অহং-জ্ঞান যতদিন থাকে, ততদিন অহং সত্য, কিন্তু একদিন যখন সে অহং-জ্ঞান দূর হয়, তখন "অহং" অনিত্য অশাশ্বত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। আমরা যাহাকে আত্মা বলিয়া বুঝি, 'অহং' সেই আত্মার একটি অবস্থামাত্র—evolved Stage মাত্র। সেই অবস্থা অতিক্রম করিলে আর অহমিকা-জ্ঞান থাকে না, কর্ত্তৃত্বজ্ঞান থাকে না। আত্মাকে প্রসরণশীল যোগপরায়ণ বলিয়া মানিলে, expansive interpenetrative বলিয়া ধরিলে, জন্মজন্মান্তরে যে "কর্ম্মের" বা চরিত্রের বিবর্ত্তন হইবার কথা বুদ্ধদেব বলিতেন, সেই চরিত্র বা "কর্ম্ম" dynamic অস্থাবর আত্মার অন্তর্ভূত হইয়া যায়। ইংরাজীতে যাহাকে Person বা personality বলা হয়, বাঙ্গালাতে যাহাকে ব্যক্তিত্ব বলা যাইতে পারে, সেই ব্যক্তিত্ব dynamic এবং "কর্ম্মনিয়মের" অধীন। ব্যক্তিরই চরিত্র থাকে। চরিত্রের গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়—ব্যক্তিত্বলাভ হয়। এবং দার্শনিক Lotze লোট্জ যেমন বলিয়াছেন যে, মানুষে পূর্ণ ব্যক্তিত্ব (perfect personality) সম্ভব নয়, এক মাত্র ভগবান্ই পূর্ণ ব্যক্তি, পূর্ণ চরিত্র, উন্নতির অতীত, ক্রমবিকাশের বাহিরে—সেই ভাবে বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তিতে পূর্ণ ব্যক্তিত্বলাভ—ক্রমবিকাশের পরাকাষ্ঠালাভ করিয়া আমরা ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হই। অথবা অনন্তকাল জ্ঞানবস্তুর সহিত যোগযুক্ত

থাকিয়া, বিবর্ত্তনের সীমায় পৌছিয়া, পূর্ণব্যক্তিত্ব বা বুদ্ধত্ব-প্রাপ্ত হই। সাধু অঘোরনাথের অনুসরণে এইরূপে ব্যাখ্যা করিলে, বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক রহস্য ভেদ হয় এবং কঠিন সমস্যাগুলির মীমাংসা পাওয়া যায়।

বৌদ্ধশাস্ত্রে মানুষকে রথের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। যেমন চক্রাদি নানা অংশের যোজনা করায় রথ তৈয়ারী হয় এবং চক্রদণ্ড রজ্জু ইত্যাদি অংশগুলিকে পরস্পর পৃথক করিলে রথ থাকে না, সুতরাং সেই সংযোজনার ভিতর "রথ" বলিয়া কোনও অংশের অতীত স্বতন্ত্র বস্তু নাই—সেইরূপ দেহ মন প্রাণাদির অতিরিক্ত কোনও বস্তু মানুষে নাই, যাহাকে "আত্মা" বলা যাইতে পারে। এই ব্যাখ্যাকে বাস্তবিক static বা mechanical unity বলা যাইতে পারে। জীব-দেহে কিন্তু organic unity (জৈবিক বন্ধন) আছে, যাহাকে আমরা 'প্রাণ' বলি। প্রাণের বিহনে জীবদেহ নষ্ট হইয়া যায়। প্রাণই জীবদেহকে রক্ষা করে, জীবন্ত করে এবং বিকশিত ও বর্দ্ধিত করে। অতএব প্রাণযোজিত দেহ কতক মাত্রায় static, কতক মাত্রায় dynamic, কতক অচল, কতক চঞ্চল, আংশিক ভাবে স্থিতিশীল ও আংশিক ভাবে গতিশীল। প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে আবার মনের অধিষ্ঠান যেখানে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠে, সেখানে বলিতে পারা যায় যে, স্থিতি-শীলতা কমিয়া গতিশীলতা বা ক্রিয়াশীলতার মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে, অধিকতর ভাবে dynamic হইয়া উঠিতেছে। জীব সেইজন্য যন্ত্রমাত্র নহে, তাহাকে জীবন্ত যন্ত্র, "যা একাধারে যন্ত্র ও যন্ত্রী" বলা যাইতে পারে। মানুষের ভিতরে যখন চরিত্র গঠিত হইতে থাকে, তখন যে unity বা সংস্থান বা "রথ"এর (organisation or constitution) সৃষ্টি হইতে থাকে, তাহাকেই ব্যক্তিত্ব বলা যায়—

person বা personality বলা যায়। এই ব্যক্তিত্ব একেবারেই স্থিতিশীল নয়। পূর্ণ ভাবে গতিশীল, ক্রিয়াশীল বা dynamic, অথচ ইহাতে গতির সাম্য ও ক্রিয়ার সামঞ্জস্য (balanced action বা equilibrium) থাকে বলিয়া ইহাকে স্থিতিশীলও বলা যায়। স্থির, ধীর, দৃঢ়, প্রশান্ত-চরিত্র বলিলে যে তাহাতে কোনও পরিবর্ত্তন নাই বুঝায় তাহা নয়, পরিবর্ত্তন আছে, গতি আছে, ক্রিয়া আছে, কিন্তু তাহা উন্নতির দিকে—অবনতির দিকে নয়। হীনাবস্থা সম্বন্ধেই তাহার স্থিরতা, ধীরতা, দৃঢ়তা, প্রশান্ত, অপরিবর্ত্তনীয় ভাব। নিম্ন-গামী নহে বলিয়া, পদস্খলিত হয় না বলিয়াই, তাহার অপরিবর্ত্তনীয় ভাব আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। চরিত্র, প্রকৃত সুচরিত্র, প্রকৃত ব্যক্তিত্ব সেই জন্য dynamic হইয়াও statico dynamic, চঞ্চল হইয়াও "অচল—সচল", দুই ভাববিশিষ্ট, পরিবর্ত্তন-অথচ-অপরিবর্ত্তনশীল। দুগ্ধ বিকারে দধির ন্যায় continuous-dis-continuous, আরম্ভে এক, পরিণামে অন্য, ভিন্ন-অথচ-অভিন্ন যে কর্ম্ম বর্ণিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে—সেই কর্ম্মই চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব।

বৌদ্ধধর্ম্ম বলিতেছেন যে, যতদিন কর্ম্ম থাকে, কর্ম্মফল উৎপন্ন হইতে থাকে, ততদিন জন্ম হইতে জন্মান্তরে যাইতে হয়। কোন জন্ম হইতে অন্য জন্মে গতি কি প্রকারে কোন পথে ঘটিয়া থাকে, তাহার বিষয়ে বুদ্ধদেব অনেকটা নিরুত্তর ছিলেন। সে সকল আলোচনা অনর্থক ও অপ্রাসঙ্গিক মনে করিতেন। যদি একজন বিষাক্তবাণে বিদ্ধ হয়, সে কি তখন অনুসন্ধান করিতে চায়, কার বাণ? কোথা হইতে আসিল? চিকিৎসক কোন্ জাতীয়? চিকিৎসক কি আহার করেন? কোথায় থাকেন ইত্যাদি? সে বিষমুক্তই হইতে চাহে। বিষমুক্তির পর ঐ সকল গবেষণার অবসর হইবে।

সেইরূপ এই জীবনে পাপ ও দুঃখ-মুক্তির সময়, পরকালে কোথায় যাইব, কে লইয়া যাইবে ইত্যাদি প্রশ্ন অবান্তর কথা। এইরূপে দেখা যায় যে, পরকালতত্ত্বের বিষয়ে নিরুৎসাহ দিয়া বুদ্ধদেব আবার আশ্বাস দিতেছেন যে. উন্নত-চরিত্র হইলে, পবিত্র চরিত্র অর্হত্ব লাভ করিলে, এই সকল সমস্যার বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইবে। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি হইলে অভিজ্ঞতা লাভ হয়। একদিকে নিরুৎসাহ, অন্যদিকে আশ্বাস। Blowing hot and cold, শঠাচরণ, প্রতারণা নয় কি? কখনই নয়। আজকাল পাশ্চাত্য জগতে যে activisim—কর্ম্মপরায়ণতার কথা আলোচিত হইতেছে, বুদ্ধের শিক্ষা সেই কর্ম্মপরায়ণতার কথাই বিশেষভাবে প্রকাশ করিতেছে। কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞান—প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। কর্ম্ম না করিলে, কেবল কল্পনায় অবচ্ছেদ abstraction আসিয়া পড়ে। সংসারে জীবন যাপন করিতে করিতেই অভিজ্ঞতা লাভ হয়। কর্ম্মানুষ্ঠানে চরিত্র গঠিত হইতে হইতেই নূতন চেতনা, নূতন দৃষ্টি লাভ হয় এবং তাহা দ্বারা নূতন জ্ঞান লাভ হয়, পুণ্য-স্বভাব, পুণ্যচরিত্র হইলে নূতন সত্য নূতন মর্ম্ম গ্রহণ হয়। তাই কম্মনিয়মের অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়া, পুণ্য-সাধনের জন্যই শিষ্যদিগকে, ভিক্ষুদিগকে একাগ্র করিয়া দিতে বুদ্ধদেবের এত চেষ্টা, এত যত্ন।

গঠিত-চরিত্র, লব্ধব্যক্তিত্ব, নির্ব্বাণযুক্ত হইলে জন্মজন্মান্তর আর হয় না। ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন আর হয় না। বারম্বার এই শিক্ষা দিয়া আবার দেখা যায় যে, অনেকগুলি উপদেশে বলা হইয়াছে যে, নির্ব্বাণলাভের জন্য যে চরিত্রসাধন, পুণ্যসাধনের চেষ্টা—সে চেষ্টা হেতুমূলক বলিয়া ব্যর্থ হইয়া যায়—নির্ব্বাণ-লাভ আর হয় না। নির্ব্বাণ আমাদের গন্তি, তথাপি নির্ব্বাণের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া

বিশ্বনিয়মের অধীনে থাকিয়া কর্ম্মনিয়ম ও ধর্ম্মনিয়ম অনুসারে জীবন যাপন করিলেই নির্ব্বাণ আপনিই আসিবে। নির্ব্বাণের বাসনা, নির্ব্বাণের লোভও লোভ এবং বাসনা, অতএব পরিত্যজ্য। ভবতৃষ্ণা পরিত্যজ্য, বিভবতৃষ্ণাও পরিত্যজ্য। কিছু হইবার বাসনাও থাকিবে না। কিছু না হইবার বাসনাও থাকিবে না। কর্ম্মনিয়মে, ধর্ম্মনিয়মে পুণ্যের, প্রেমের চালনায় যা হয় হইবে—যা না হয় তা হইবে না। কেবল পুণ্যপ্রেমচালিত হইয়া জীবন ধারণ করিবে এবং সেই জীবন যাপন করিতে করিতে নূতন দৃষ্টি, নূতন অভিজ্ঞা আসিবে। সেই অভিজ্ঞায় জানিতে পারিবে, গঠিতচরিত্র "অনাগামি"গণের, লব্ধব্যক্তিত্ব অর্হৎগণের, নির্ব্বাণমুক্ত বোধিসত্ত্ব বুদ্ধগণের প্রত্যাবর্ত্তন নাই। আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে, প্রত্যাবর্ত্তনের কথা সহজেই বোধগম্য হয়। যন্ত্রের চাকা একদিকে চালাইয়া আবার বিপরীত দিকে চালান যায়। ঘড়ির কাঁটা ডানদিকে ঘুরাইয়া বামদিকে ঘুরান যায়। ইহাকে mechanical reversibility যন্ত্রের বিরুদ্ধগতি বলা হয়। জীব-জগতে "বীজনিয়মে" এ রকম বা এতদূর গতিপরিবর্ত্তন বা প্রত্যাবর্ত্তন নাই। দুগ্ধকে দধিতে পরিণত করা যায়, কিন্তু দধিকে আর দুগ্ধেতে পরিবর্ত্তিত করা যায় না। বালক যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে অগ্রসর হয়, কিন্তু বৃদ্ধ আর যুবা বালক বা শিশু হয় না। চিত্তনিয়মে ও মনোরাজ্যে চরিত্র সম্বন্ধে, সাধুতা সম্বন্ধে, ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধেও আর প্রত্যাবর্ত্তনের নিয়ম ঘটে না। তবে আমরা জানি যে, মানসিক বিকার ঘটিয়া মনের অধোগতি হওয়া অসম্ভব নয়। অপরিপক্কাবস্থায় চরিত্রেরও স্খলন হয়। তাই বীজ-নিয়ম, চিত্তনিয়ম, কর্ম্মনিয়মের, রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন অল্পাধিক আছে। কিন্তু ধর্ম্মনিয়মের সোপানে উঠিয়া অনাগামী অর্হৎ বুদ্ধ হইলে ইহার

কোনরূপ প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। সেখানে reversibility বিরুদ্ধগতি নাই। সেখানে গেলে আর পতন হয় না, কেবলই উত্থান। উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ। হীনাবর্ত্তন নাই। নির্ব্বাণের এই আধ্যাত্মিক ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই, বুদ্ধদেব প্রচলিত পুনর্জন্ম-বাদের সংস্কার করিয়া, তাহাকে লৌকিক দৃষ্টি হইতে মুক্ত করিয়া, লোকোত্তর ভাবে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

চিত্তনিয়মে জ্ঞানের সামীপ্য।

সকল ধর্ম্মেই, সকল বিধানেই ঈশ্বরের দূরতা আর সামীপ্য বিষয়ে কোন না কোনও শিক্ষা পাওয়া যায়। ঈশ্বর হইতে মানুষ দূরে কেন? কি প্রকারেই বা সামীপ্য লাভ হয়? প্রত্যেক বিধানের কাছেই এ বিষয়ে আমরা কিছু না কিছু শিক্ষা পাই। অজ্ঞানের দূরতা অক্ষম-তার দূরতা, অপ্রেমের দূরতা, পাপের দূরতা, নিরানন্দ অশান্তির দূরতা, সসীমের দূরতা, ইত্যাদি ~~ইত্যাদি~~ নানাবিধ দূরতার উল্লেখ আছে, এবং সেই দূরতা পরিহারের নানা উপায়ও বর্ণিত আছে। নববিধানে সকল দূরতাই স্বীকৃত হয়ে, ব্রহ্মকৃপাগুণে সকল দূরতা নিবারণের, সামীপ্য সাধনের কথাও বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

বাহিরের বিশ্বসংসার যখন প্রাচীর হ'য়ে চারিদিক বেষ্টন করে থাকে, তখন জগৎ সংসার ব্যবধান হয়। এই প্রাচীরকে যতই দূরে সরান হউক না কেন——তাহা প্রাচীরই থাকিয়া যায়; তবে প্রাচীর যত দূরে যায়, ব্রহ্ম তত নিকটে আসেন। ব্রহ্মের সঙ্গে—অন্নময় ব্রহ্মের সঙ্গে পরিচয় হয়, প্রকৃতিতে সংসারে। প্রাচীর যখন স্বচ্ছ হয়, তখন সামীপ্য বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু ইহাতেও মন

সন্তুষ্ট হয় না। প্রাণের ভিতরে কে যেন বলে, সকলি ক্ষণিক, সকলি অসার, সকলি চঞ্চল, সকলি অনিত্য। তখন বাহিরে থেকে অন্তরে গতি। সেখানে সামীপ্য অন্বেষণ করা একদিক থেকে সহজ, আবার একভাবে কঠিন। কঠিন, কেননা দেহের অসারতা বা অনিত্যতা সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু মনের অসারতা অনিত্যতা সহজে জানা যায় না। সহজ, কেননা চিত্তের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, মন আর কিছু নহে—কেবল নানা চিন্তা, নানা ভাব, নানা ভাবনা, নানা চেষ্টার অবিরাম প্রবাহ। মন এত চঞ্চল, এত অস্থির—তরঙ্গের উপর তরঙ্গ—নিশ্চলতার কোনও চিহ্ন নাই। যাঁরা এই চাঞ্চল্য দেখে, নিরাশ না হয়ে, যোগসাধন করেছেন, তাঁরা এই অস্থিরতাকে স্থিরতায় এনেছেন। তাঁরা চিত্তকে সংযত করতে পেরেছেন। যোগী চিত্ত ধ্যানসাধনে সকল অমনোযোগ দূর করে, মনকে বশীভূত ক'রে, মনের সকল প্রবাহকে এক নির্দ্দিষ্ট ধারায় নিয়ে যেতে পেরেছে। আবার দেখা যায় যে, জ্ঞানী যখন একমনে জ্ঞানসাধন করেন, তখনই চিত্তচাঞ্চল্য চলে যায়, অস্থিরতা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়, ধীরে ধীরে স্থিরতায় পূর্ণ হয়ে জ্ঞানীর মন প্রশমিত প্রশান্ত হয়ে উঠে। একনিষ্ঠ হয়ে আবার যাঁরা কর্ম্মে ব্রতী হন, তাঁদেরও মনের চাঞ্চল্য দূর হয়ে, দৃঢ় প্রশান্তচরিত্র গঠিত হতে থাকে। ভক্তি-সাধনের পথেও ক্রমে ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল ভাব দূর হ'য়ে, স্থির ধীর অথচ উৎসাহ-পূর্ণ ভক্তচরিত্র ভক্তব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এই সব ব্যাপারকেই শাক্যমুনি "চিত্তনিয়ম" নাম দিয়াছিলেন। ভাসা ভাসা ভাবে মনকে বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় বটে যে, চিত্তের যা কিছু, তা চঞ্চল, এবং চিত্তবৃত্তিগুলির উৎপত্তিতে বা কার্য্যে কোনও শৃঙ্খলা বা নিয়ম নাই। কিন্তু দেখা যায় যে, কোনও অভিপ্রায় বা

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্মুখে ধরিলে, অমনি চিন্তার, ভাবের, চেষ্টার ধারা নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে থাকে এবং তাহাদের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়ে যায়। কায়মনোবাক্যের কার্য্য যত নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে ততই চিত্তচাঞ্চল্য দূর হয়। চরিত্র যত গঠিত হতে থাকে চিত্তের ধীরতা, দৃঢ়তা, প্রশান্ত ভাব ততই ফুটিয়া উঠে। নিজের জীবনে নিজের চরিত্রের স্ফুরণে বুদ্ধদেব যে চিত্তনিয়ম দেখিলেন সেই নিয়ম জানিবার জন্য চরিত্র গঠনের ও ধ্যানসমাধির জন্য, কত সাধন প্রবর্ত্তিত করিলেন। নববিধানে আমরা শিখেছি যে, চিত্তনিয়মের দ্বারা মন, প্রাণ চালিত হলেই পরমাত্মার সামীপ্য অনুভব হয়। তিনি যে বহুদূরে নন, নিকটের নিকট, আত্মার আত্মা, সেই জ্ঞান, সেই দর্শন, সেই পরিচয় লাভ হয়। আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য শেষ জীবনে রামমোহন ব্যস্ত হলেন। পরমাত্মার ও জীবাত্মার মধ্যে আকাশের ব্যবধান নাই তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রৌঢ়াবস্থায় বিশেষরূপে জানিলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র যৌবনেই ব্রহ্মবাণী অনুসরণ করিয়া অন্তরে পরমাত্মসামীপ্য অনুভব করিলেন। বুদ্ধদেব ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই কিন্তু এ কথা বলা যায় যে সাধনবলে তিনি জানিতে পারিলেন যে চিত্তনিয়মের অধীনতায় সূক্ষ্ম-জগতের সহিত, আধ্যাত্মিক জগতের সহিত যোগ স্থাপিত হয়।

এই আধ্যাত্মিক জগতের কথা, আধ্যাত্মিক ব্যাপারের বর্ণনা মানুষের ভাষায় ঠিক হয় না। মানুষের ভাষা দেশ, কাল, কারণ দ্বারা আবদ্ধ। আধ্যাত্মিক সকল ব্যাপারই দেশ, কাল, কারণের অতীত। এই জন্য সে রাজ্যের কথা উপমাচ্ছলে রূপকথায়, Parableএ, উদাহরণে, myth legend ইত্যাদি দ্বারা ব্যক্ত করিতে হয়। স্বপ্ন-রাজ্যের কথা একদিন বলা হ'য়েছিল যে, স্বপ্ন আমিত্বময়।

স্বপ্ন দ্রষ্টাই স্বপ্নেতে প্রধান নায়ক।—hero। যে স্বপ্ন দেখে সেই কর্ত্তা। জাগ্রদাবস্থার আমিত্বপূর্ণ অনেক ব্যাপারও স্বপ্নের মত অলীক অনিত্য। যে জীবনে আমি কর্ত্তা, সে জীবন গঠিত হয় না। যে সংসারে, যে পরিবারে আমি কর্ত্তা সে সংসার, সে পরিবার স্থায়ী হয় না। যে রাজ্য, যে সাম্রাজ্য আমি চালাতে চাহি, সে রাজ্য, সে সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। আধুনিক স্বপ্ন-বিজ্ঞান আর এক কথা বলেন, সে বিষয়টাও জাগ্রদাবস্থায় ঘটে। স্বপ্নতে আমরা চিন্তা করি না—স্বপ্নতে আমরা ধারণার (conceptএর) অস্তিত্ব পাই না। সকল ধারণা সেখানে প্রত্যক্ষমূর্ত্তি হয়ে, দৃশ্য হয়ে, দ্রষ্টব্য পদার্থ হয়ে উপস্থিত হয়। স্বপ্নে আমরা abstract অবচ্ছেদ দেখি না, conerte বস্তু দেখি। যেমন স্বপ্নে হিংসা নামে কোন চিন্তা বা ধারণা উপস্থিত হয় না, হিংস্রক জন্তু, বাঘ বা সিংহ বা পাগলা কুকুর মূর্ত্তিমান দেখি। দেখি একটা বাঘ এসে আমার ভাইকে আক্রমণ করিল, দেখিতে দেখিতে সেই বাঘ আমার মূর্ত্তি ধারণ করিল। অর্থাৎ স্বপ্নে আমি দেখিলাম যে, আমি আমার ভাইকে হিংসা করি। স্বপ্ন বিজ্ঞান দ্বারা এখন বুঝা যাইতেছে যে, সকল দেশে, যত কল্পনা, উপকথা, রূপকথা myth lenged আছে সমস্তই বাস্তবিক স্বপ্নে লব্ধ—স্বপ্নে দৃষ্ট। অর্থাৎ ধারণার জন্য—conceptএর জন্য যখন ভাষা চলে না বা যখন ভাষায় কুলায় না, তখন কল্পনার ভাষা ব্যবহৃত হয়—তখন রূপ কল্পনা করিতে হয়। Daydreams বা দিবাস্বপ্ন বা আকাশকুসুমের অবস্থায় আমরা জাগ্রত থাকিয়াও স্বপ্ন দেখি—সেখানে কল্পনা, রূপকথা ও উপকথার সৃষ্টি হয়। জাগ্রত অবস্থার তুলনায় যেমন স্বপ্নাবস্থা, concept বা ধারণাশূন্য এবং রূপ কল্পনায় বা percept এ পরিপূর্ণ, সেই প্রকার অধ্যাত্মরাজ্যের তুলনায়

আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক বা সাংসারিক রাজ্য উচ্চতর ভাষা-শূন্য এবং দেশ কাল কারণে আবদ্ধ ধারণার ভাষায় পূর্ণ। অর্থাৎ আধ্যাত্মরাজ্যের কথা ধারণার ভাষায় বর্ণিত হইতে পারে না। ধারণা মাত্রই দেশ কালে আবদ্ধ, স্থিতিশীল static এবং fixed, স্থতরাং গতিশীল সচল dynamic আধ্যাত্মরাজ্যের কথা যথাযথ প্রকাশ করিতে পারে না। আবার যাহারা ধারণার ভাষায় বিশেষরূপে শিক্ষিত বা অভ্যস্ত নহে, তাহাদিগকে রূপের ভাষায়, প্রত্যক্ষের ভাষায় (perceptional symbolic) ভাষায় উচ্চতর সত্য শিক্ষা দিতে হয়। তাই দেখা যায়, সকল দেশেই মহাপুরুষেরা উপমা, উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, palableএর ভাষা ব্যবহার করিয়া লোকজনকে শিক্ষা দিয়াছেন। মহর্ষি ঈশার parables উদাহরণ সমুদয়ে আধ্যাত্মিক ব্যাপারের পার্থিব প্রকাশ। স্বর্গরাজ্য, সর্ষপসদৃশ্য বীজে আরম্ভ হইয়া বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়, তথায় নানা জাতীয় পক্ষী বাসা নির্ম্মাণ করে, ছায়ায় কত জীব আশ্রয় লয়। মানুষ প্রভু ঈশ্বরের নিকট ধন পাইয়াছে, প্রেমধন পাইয়াছে তাহাকে খাটাইয়া বিতরণ করিয়া বৃদ্ধি করিবার জন্য দয়াময়ের পিতার রাজ্যে প্রত্যক্ষ রাজ্যে, প্রত্যেক জীবের, প্রত্যেক মানুষের—অবাধ্য সন্তান যে, পাপী যে, দরিদ্র নগণ্য যে, তাহারও স্থান আছে। তাহারও জীবনে ভগবানের মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। এই প্রকারে আধ্যাত্মিক ব্যাপার—সকল রূপকথায় ব্যক্ত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের parables গুলিও অতি চমৎকার এবং উপদেশপূর্ণ। একটি গল্পে আছে, একজন লোক দুগ্ধ ক্রয় করিয়া গোয়ালার কাছে রাখিয়া গেল। বিলম্বে আসিয়া দেখে দুগ্ধ দধি হইয়া গিয়াছে। সে গোয়ালার নিকট দুগ্ধ চাহিল দধি ত সে কেনে নাই। এই রূপকে বাস্তবিক প্রত্যাবর্ত্তন নাই—বীজ

নিয়মে, অধ্যাত্মজগতে প্রত্যাবর্ত্তন নাই, সেই কথাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে (irreversibility) দুগ্ধ, দধি হয়, কিন্তু আর দুগ্ধ হয় না।

আর একটি গল্প আছে যে, একজন আসিয়া বুদ্ধদেবকে বলিল যে, হস্তিনীর পদচিহ্ন দেখিয়া যেমন হস্তিনীর অনুমান করা যায়, তেমনি বুদ্ধের কতকগুলি বাক্য অপরের নিকট শুনিয়া সে ব্যক্তি বুদ্ধদেবকে না দেখিয়াই চিনিয়াছিল। বুদ্ধদেব তখন সেই হস্তিনীর পদচিহ্ন আখ্যায়িকাকে বিস্তারিত করিয়া শিক্ষা দিলেন যে, অনুমানের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করা চাই। হস্তিনীকে প্রত্যক্ষ দেখা চাই। "ঐ সেই হস্তিনী" বলিতে পারা চাই। অর্থাৎ অনুমান দ্বারা কোনও এক হস্তিনীর অস্তিত্ব স্বীকার হয়। প্রত্যক্ষদ্বারা হস্তিনী বিশেষের পরিচয় হয়। Abstract অপেক্ষা concrete ভাল। নির্ব্বিশেষ অপেক্ষা বিশেষ জ্ঞান অধ্যাত্মরাজ্যে বিশেষ আদরণীয়। ভাসা ভাসা সার্ব্বজনীন উদারতা বা প্রেম অপেক্ষা, ব্যক্তি বিশেষকে প্রেম করায়, ব্যক্তি গঠনের প্রতি প্রেমের গভীরতা/ প্রেমের প্রকৃত পরিচয় হয়।

নির্ব্বাণ ও নবচেতনা।

নববিধানে আমরা অতুল ধনে ধনী। হিন্দুস্থানের যোগ ও ভক্তির ধর্ম্ম, পাশ্চাত্য জগতের কর্ম্ম ও সেবার ও আদেশের ধর্ম্ম সমস্তই আমাদের। স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেনের কথায় বলি যে, যেখানে যে ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে সকলই আমাদের জন্য। নববিধানের জন্মবিবরণ আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, মুসলমানও

খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত উপনিষদের ধর্ম্মের, পৌরাণিক ধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংযোগে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন ও উন্নতি হয়। নববিধানে এই সকল ধর্ম্মের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিত করা হইয়াছে এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিত করা হইতেছে। তাই আচার্য্য বলিলেন, বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলাইয়া জ্ঞানের রথে চড়িয়া মার কাছে যাই। মা বিধানজননী কত রত্নে ভূষিত করিতেছেন নববিধানকে। সেই সকল রত্নের অধিকারী আমরা। জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সঙ্গে মিলাইয়া নববিধানের আলোকে আমাদের সকল ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। আর জীবনের দ্বারা যে জ্ঞান, অভিজ্ঞা, নবচেতনা লাভ হয় তাহারও সাহায্যে আমরা সকল ধর্ম্মের, সকল শিক্ষার, সকল মত ও বিশ্বাসের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিব। অগ্রবর্ত্তী সাধক বিনয়েন্দ্রনাথ ব্রহ্মমন্দিরে বেদী হইতে যে কয়েকটী শেষ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, জীবন দিয়ে জীবনের পরিচয় হয়। জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জ্ঞান, নূতন চেতনা লাভ হয়। জীবনের ভিতর দিয়ে যে অভিজ্ঞা, যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত অভিজ্ঞা। শিশু বালিকা জীবনের বিকাশে যে নারীত্ব লাভ করে এবং মাতৃত্ব লাভ করে, সে জ্ঞান, সে চেতনা, শত পুস্তক পাঠে, শত উপদেশ শুনিয়া, শত দৃষ্টান্ত দেখিয়া বালিকা বুঝিতে পারে না। বুদ্ধের যে সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞা, তাহা বালক কি যুবককে, শতবার বুঝাইলেও বুঝে না। জীবনলব্ধ জ্ঞান অভিজ্ঞা, আর চেতনা এক শ্রেণীর বস্তু, আর বিদ্যা, পাণ্ডিত্য শ্রুত সংবাদ অন্য শ্রেণীর বস্তু।

তাই দেখা যায় যে, যখন শিষ্যেরা, বিরোধীরা শাক্যমুনির নিকট নির্ব্বাণের কথা, নির্ব্বাণ অবস্থায় কি হয়, সে অবস্থা কি প্রকার ইত্যাদি

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত শাক্যমুনি মৌন থাকিতেন। নির্ব্বাক থাকিতেন। অথচ সকলেই তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিত; তিনিও যে এ বিষয় জানিতেন না তাহা বলিতেন না। কয়েকবার তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার নিকট নির্ব্বাণ রহস্যের উত্তর লাভের আশায় থাকিলে জিজ্ঞাসুর মৃত্যু ঘটিবে তবু ও সে উত্তর পাইবে না। বুদ্ধ-শিষ্যেরাই যখন নির্ব্বাণ রহস্য জানেন নাই তখন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ে যে সে বিষয়ে মতভেদ হইবে, আশ্চর্য্য কি? এবং পাশ্চত্য পণ্ডিতেরা (যাঁহারা লুপ্ত উদ্ধারে এত পরিশ্রম ও যত্ন করিতেছেন) তাঁহারাও যে অর্থ ভেদ করিয়া ফেলিবেন, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? নির্ব্বাণের অর্থ সম্বন্ধে সাধু অঘোরনাথ, নববিধানের আলোকে, যাহা বলিয়া গিয়াছেন, ক্রমে তাহাই দাঁড়াইতেছে। "বুদ্ধ-দৃষ্টি" অর্থে প্রত্যাদিষ্ট অবস্থা এবং বুদ্ধত্ব লাভ অর্থে নবচেতনা লাভ।

নির্ব্বাণ লাভ হইলে নূতন চেতনা লাভ হয়, এই কথাই ঠিক। বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্ব্বাণের বিষয় স্থলে স্থলে যেরূপ লেখা আছে, তাহাতে নির্ব্বাণ অর্থে ধ্বংস (annihilation)—অহমের, আত্মার ধ্বংস—বলা যাইতে পারে। আবার অন্যত্র নির্ব্বাণকে মোক্ষের অবস্থা (summum bonum) কল্যাণ, মঙ্গল, শান্তিপূর্ণ অবস্থা বলা যাইতে পারে। আবার যখন দেখা যায় যে, নির্ব্বাণের পর অনন্ত জ্ঞানবস্তুর সহিত এক হইয়া যোগযুক্ত হইয়া, বুদ্ধদেব আকাশ-বিপুল হইয়া গেলেন তখন তাহাকে যোগের অবস্থা, ব্রহ্মনির্ব্বাণের অবস্থাও বলা যাইতে পারে। নববিধানে আমরা এ সকল অর্থই গ্রহণ করিতে পারি। প্রত্যাদিষ্ট অবস্থায়—যেখানে অবিরাম প্রত্যাদেশ চলিতেছে, যেখানে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রত্যাদেশ দ্বারা জীবন চালিত হইতেছে, সেখানে তিনটী ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে। সেখানে আমিত্বের

ধ্বংস হইয়াছে, অহংপাখী উড়িয়া গিয়াছে, আর ফিরিবার নয় "never to return"। আবার প্রত্যাদিষ্ট জীবনেই মোক্ষলাভ হয়, পরম কল্যাণ, সর্ব্বমঙ্গল (summum bonum) লাভ হয়। প্রত্যাদিষ্ট জীবনই মোক্ষ, সকল মঙ্গল, সকল পুণ্য, সকল আনন্দ, সকল শান্তিতে পূর্ণ। তৃতীয়তঃ প্রত্যাদিষ্ট জীবনই প্রকৃত যোগযুক্ত জীবন। অন্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ, পরমাত্মা দ্বারা চালিত; ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিত, চেতনায় চেতনা মিলিত, নবচেতনার অবস্থা। এই নবচেতনায় পুরাতন চেতনার বিনাশ হয় না, পরন্তু সেগুলির বিকাশ ও পরিণতি হয়। পুরাতন জ্ঞান, অভিজ্ঞা নষ্ট হয় না। ধ্বংসে সকলের খণ্ডত্ব, সকলের আংশিক ভাব চলিয়া যায়, এবং তাহারা পূর্ণতা লাভ করে। নবচেতনার কথা কি বোঝা যায়? নবচেতনা লাভ না হইলে কি নবচেতনার রহস্যভেদ করা যায়? তাই আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি, কেন বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ সম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করিতেন। সাধনের পথে যাহারা অগ্রসর হয় নাই, তাহাদিগকে কি প্রকারে সিদ্ধ অবস্থার কথা বলা যায়? সাধন করিতে করিতে, ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে করিতে যখন পুণ্যচরিত্র লাভ হইয়া অর্হত্ব লাভ হইবে, তখনই নির্ব্বাণের রহস্য ভেদ করা, নবচেতনার কথা বুঝা সম্ভব হইবে। চেতনা লাভ করিয়াই জানা যাইবে, কি প্রকার সে চেতনা। তাহার পূর্ব্বে শত উপদেশেও তাহার মর্ম্মগ্রহণ সম্ভব হইবে না। অতএব সেরূপ উপদেশ বৃথা।

এই এক কারণ। আর একটি গুরুতর কারণ আছে। নির্ব্বাণের অবস্থার লোভে যদি ধর্ম্মসাধন করা হয়, তাহা হইলে প্রকৃত অহেতুক ধর্ম্মসাধন হইল না এবং তাহা না হওয়াতে নির্ব্বাণপ্রাপ্তিও ঘটিবে না। অতএব নির্ব্বাণ লাভের জন্য নির্ব্বাণ-রহস্য ভেদ, নির্ব্বাণ অবস্থা

বিষয়ের জ্ঞান (irelevant) অপ্রাসঙ্গিক। নির্ব্বাণের পর যদি কোনও প্রকার জীবন লাভের লোভ হয়, তাহাও এক প্রকার ভবতৃষ্ণা হইল। নির্ব্বাণের পর যদি ধ্বংস পাইবার ইচ্ছাও হয়, তাহাও এক প্রকার লোভ, তাহাকে বিভবতৃষ্ণা বলা যায়। কোনও তৃষ্ণা থাকিলে নির্ব্বাণ হইল না।

নির্ব্বাণ অর্থে তৃষ্ণার নির্ব্বাণ, বাসনার নিবৃত্তি। বাসনা হইতে সকল দুঃখের উৎপত্তি। অতএব নির্ব্বাণ হইলে দুঃখ-মুক্তি হয়। যে কারাবদ্ধ, সে কি মুক্তির পর কি করিবে, কোথায় যাইবে, ইত্যাদি ভাবে—না—মুক্তিলাভই তার একমাত্র আগ্রহ? মুক্তিলাভ ত হউক তারপর অন্য চিন্তা, অন্য জ্ঞান, অন্য ধ্যান। বুদ্ধদেব সময় সময় চিকিৎসকের ভাষা ব্যবহার করিতেন। পাপ দুঃখকে রোগ বলিয়া, তাহার নিদান ও তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হয় বলিতেন। জ্বরের জ্বালায় যখন রোগী অস্থির তখন কি অন্য কোনও চিন্তা স্থান পায়? তখন সেই প্রদাহ নির্ব্বাণ, সেই প্রদাহ শান্তিই একমাত্র ব্যবস্থা। বাসনার জ্বালায় যখন আমাদের জীবন অস্থির, তখন সেই জ্বালার নির্ব্বাণই—সেই অগ্নির নির্ব্বাণই প্রথম অবস্থা। নির্ব্বাণ লাভের পর কি হইবে, নির্ব্বাণ লাভ করিলেই তাহা জানা যায়। অতএব তৎপূর্ব্বে নির্ব্বাণের আলোচনা, অপ্রাসঙ্গিক, অনাবশ্যক, ক্ষতিকর।

নির্ব্বাণ সাধন করিতে হইবে, অথচ নির্ব্বাণ প্রসঙ্গ করিবে না। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের এই কথা শুনিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাকে অসংলগ্ন (inconsistent) শিক্ষা বলিয়াছেন। কিন্তু এখানে সামঞ্জস্যের কোনও অভাব নাই। এইখানেই ত বিশ্বাসের ভূমি, বিশ্বাসের ক্ষেত্র, বিশ্বাসের আবশ্যকতা। সিদ্ধ যোগীর কথায় বিশ্বাস করিতে হইবে।

নবচেতনা যাঁহার লাভ হইয়াছে তাঁহার কথায় আস্থা রাখিতে হইবে তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিতে হইবে। আর অন্তরে যে চালনা আসিতেছে, তাহার উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাহাকে সম্যক বিশ্বাস করিতে হইবে। এই অন্তরের চালনা, পবিত্রাত্মার (Holy spirit) দেশনায় (guidance) বিশ্বাস করিতে হইবে। বিশ্বাস করিয়া চলিলে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হইবে, চেতনা লাভ হইবে। অন্তরের চালনা-ইঙ্গিতে যদি বুঝিতে না পার, ধরিতে না পার, মহাজনের বাক্য শ্রবণ কর, তাঁহাদের পথে চল। ক্রমে অন্তরের চালনাও বুঝিতে পারিবে, জানিতে পারিবে। এই যে অন্তরের চালনা, এই যে বিবেকবাণী, এই যে প্রত্যাদেশ, অনেক বার শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইবে। প্রথমে মাঝে মাঝে বুঝিবে মাঝে মাঝে শুনিবে, ক্রমে অবিশ্রান্ত অবিরত ধারে আসিতেছে, চলিতেছে, "কান ঝালাপালা হইতেছে" জানিতে পারিবে। ঝড় বহিতেছে শুনিবে। এই অবিশ্রাম অবিরাম চালনাকেই শাক্যমুনি "নিয়ম" নাম দিলেন। স্বরূপ-চালনা, ব্রহ্মস্বরূপ-চালনায় আমাদের জীবন চলিতেছে, আমরা জানি আর না জানি। নিরন্তর ধীশক্তি প্রেরণা হইতেছে আমরা বুঝি আর না বুঝি। তাই এই চালনাকে "নিয়ম" বলিয়া আমরা চিত্তনিয়ম কর্ম্মনিয়ম. ধর্ম্মনিয়ম ইত্যাদি প্রভেদ করিতে পারি। বুদ্ধদেব তাহাই করিয়াছিলেন মনে হয়, এবং সেইজন্য শিক্ষা দিতেন যে চিত্তনিয়ম, কর্ম্মনিয়ম, ধর্ম্মনিয়মের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দাও এই সকল নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া জীবন যাপন কর, ধর্ম্ম সাধন হইবে, নির্ব্বাণ লাভ হইবে। বুদ্ধদেব যাহাকে "নিয়ম" বলিয়া ধরিলেন, প্রত্যক্ষ করিলেন, আজ ফরাসী দার্শনিক তাহারই অংশবিশেষকে

'বীজনিয়ম'কে (elan vital) জৈবীক চালনা (vital impulse) বলিতেছেন। নববিধানে আমরা পূর্ব্বেই তাহাকে ব্রহ্মস্বরূপ-চালনা বলিয়া জানিয়াছি। উপনিষদে ইহাকে পরমাত্মার প্রেরণা, পুরাণে ইহাকে স্বরূপের আবির্ভাব, খৃষ্টীয়ধর্ম্মে ইহাকেই leading of the holy spirit, পবিত্রাত্মার চালনা বলা হইয়াছে। সুতরাং এই ব্যাপারটি সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতায় প্রকাশিত ও প্রচারিত।

জ্ঞানী সাধক অম্বিকাচরণ দেখিলেন, হিন্দুধর্ম্মের যোগ ও প্রেম ভক্তি ভাব, বৌদ্ধধর্ম্মের যোগ ও করুণা প্রধান ভাব, খৃষ্টীয়ধর্ম্মের বিবেক প্রধান ভাব, সকল ভাবের সমন্বয় সাধন আচার্য্য কেশবের জীবনে প্রাণে ~~পূর্ণ~~ পূর্ণভাবে হইয়াছে। সমন্বয় সাধনের ফলে যে নব-চেতনা লাভ হয়, সেই নবচেতনার কথা আচার্য্য কেশবচন্দ্রের উপদেশ প্রার্থনাদিতে ব্যক্ত আছে। কিন্তু সে কথা চেতনাহীন আমরা কি প্রকারে বুঝিব? সমন্বয় সাধন করিয়া নবচেতনা লাভ হইলে সে সকল কথার প্রকৃত অর্থ ও গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারিব। "নব-দুর্গার নব সন্তান" কিরূপ তাহা জানিতে পারিব। নবচেতনার বিরাটত্ব "আকাশবিপুল" ভাব বুঝিতে পারিব। নির্ব্বাণের পর যে যোগ-প্রধান জীবন, সকল ভক্তের সমাগম—পূর্ণজীবন, একমেবা-দ্বিতীয়মের রাজ্যের জীবন আসে, তাহা কি তাহা বুঝিতে পারিব। তৎপূর্ব্বে বিশ্বাস করিয়া চলিতে হইবে, নববিধানবাহকে আস্থা শ্রদ্ধা রাখিয়া চলিতে হইবে, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। করিতে করিতে একদিন ব্রহ্মকৃপায় নববিধানের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত জীবনে নবচেতনার জন্ম হইবে।

বুদ্ধদেব ও নববিধান।

আচার্য্য বলিলেন "বুদ্ধির টুলের উপর উঠিলাম, বিচারের উচ্চ সিঁড়িতে উঠিলাম, তবু যে নাগাল পাইলাম না—হে অনন্ত, আমি হাত বাড়াইতেছি, নাগাল পাইনা।" কিন্তু ব্রহ্মকৃপায় নাগাল পাওয়া ঘটিল কখন? সেই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত প্রতিষ্ঠিত হ'ল। উপাসনা প্রার্থনা—সাধনই উপায়। বুদ্ধি দ্বারা যা পাওয়া যায় না, ধ্যান দ্বারা—উপাসনা দ্বারা তাহা সহজে পাওয়া যায়। উপাসনা এলো—বুদ্ধি, যুক্তি তর্কের রাজ্য চলে গেল। বুদ্ধদেব কয় বৎসর কত সাধনা করলেন—তারপর একরাত্রে বুদ্ধত্ব লাভ করে বিশ্বরহস্য ভেদ করলেন।

ললিত-বিস্তরে যে চারিটি ধ্যানের উল্লেখ আছে, কেশবের "যোগ" পাঠ করিলে সেগুলি কেমন পরিস্কার ভাবে বুঝা যায়। বাহ্য যোগ (Objective yoga) সাধনে জগৎ অন্তরায়। শাক্যমুনি জানিলেন যে জগৎ ক্ষণিক, জগৎ অনিত্য, সংসার গতিশীল, পরিবর্ত্তনময়, বিবর্ত্তনময়। জগৎ সংসারের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে তিনি তাদের অতীত-জ্ঞানবস্তু "অনন্তজ্ঞান" বস্তুর সাক্ষাৎ পেলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কাছে যোগ দৃষ্টিতে সংসার উড়িয়া গেল না, প্রাচীর হইয়াও রহিল না—স্বচ্ছ হইয়া গেল এবং স্বচ্ছ হওয়াতে ব্রহ্মের দর্শন লাভ হইল। তৃতীয় ধ্যানে শাক্যসিংহ সুখ দুঃখ, আকর্ষণ বিকর্ষণ সকলের অতীত হইয়া নিরপেক্ষ হইয়া "নিরাত্ম" হইলেন, আমিত্ব-বিহীন হইলেন। আচার্য্যও বলিতেছেন যে, আভ্যন্তরিক যোগে (Subjective yoga) আমিত্বই বিশেষ অন্তরায়। আত্মদমনের পর আমিত্বশূন্য হইলে পরমাত্মযোগ লাভ হয়। কথিত আছে যে,

আমিত্ববিহীন নিজেকে ও বিশ্বসংসারকে নিরাত্ম জানিয়া শাক্যমুনি বুদ্ধদৃষ্টি পাইলেন, বুদ্ধত্বলাভ করিলেন। বুদ্ধদৃষ্টির ফলে তাঁহার প্রাণ অসীম করুণায় প্লাবিত হইয়া অসীম, অনন্ত, শুদ্ধসত্তার সঙ্গে একতা অনুভব করিয়া, "প্রধানপুরুষত্ব" লাভ করিলেন। প্রেমের দ্বারা সমস্ত জীবজনকে নিজের অভ্যন্তরে দেখিয়া, নিজের বিশালত্ব ও বিরাটত্ব অনুভব করিলেন। তাই বৌদ্ধরা বলেন, "বুদ্ধং জ্ঞানম্ অনন্তং হি আকাশবিপুলম্ সমম্।" বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানবস্তুর সহিত এক এবং আকাশবিপুল—অর্থাৎ আকাশ যেমন সকলকে ধারণ করে, তেমনি সেই অনন্ত-জ্ঞানবস্তুতে সকলই অন্তর্নিবিষ্ট। আচার্য্য কেশবচন্দ্রও নববিধান সাধন করিয়া দেখিলেন, "নব-বিধানের নূতন মানুষ।" সেই নূতন মানুষের মস্তকে সক্রেটিস, রসনায় শ্রীগৌরাঙ্গ, বক্ষে শ্রীঈশা, এক বাহুতে শ্রীমহম্মদ, অন্য বাহুতে মহামতি হাউয়ার্ড। ক্রমে দেখিলেন যে, নববিধানের নূতন মানুষ বিরাট আকৃতি। "নবদুর্গার নবসন্তান।" শত শত তাঁহার চক্ষু, শত শত তাঁহার কর্ণ, শত শত তাঁহার নাসিকা, শত শত হস্ত, শত শত পদ। যোগে সমস্ত নরনারী সঙ্গে মিলিত হইয়া এক অখণ্ড বিশ্বমানবের উদ্ভূতি। কেশব বলিলেন "একমেবাদ্বিতীয়ম্ ছিল স্বর্গে—একমেবাদ্বিতীয়ম্ হ'ল পৃথিবীতে।" বুদ্ধের অভিজ্ঞতায় কেশবের অভিজ্ঞতায় কত সাদৃশ্য।

শেষ সময়ের একটী প্রার্থনায় মনে হয়, মাত্র একবার নবসন্তানের বর্ণনা লেখা আছে; কিন্তু তাহাতেই বোঝা যায়, কেশবের যোগ কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল। অন্তরঙ্গগণের নিকট এ বিষয়ে আলো-চনা, কথাবার্ত্তা নিশ্চয় হইত—কিন্তু তাহার সবিশেষ উল্লেখ বা বর্ণনা নাই। অন্তরঙ্গেরা এ বিষয় আলোচনা বা বর্ণনা বিশেষ করেন নাই—

কেবল উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ কিছু করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, সাধনের গভীর কথার যদিই বা আলোচনা হইত, অতি অল্প লোকেরাই তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন বা মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন এবং নববিধানের সাধনলব্ধ এই উচ্চ শিক্ষা বা গভীর সত্য মণ্ডলীতে আদৃত হয় নাই, মণ্ডলীর চিন্তা, গবেষণা, আলোচনার উপর প্রভাব বিস্তার করে নাই, emphasis পায় নাই এবং রচিত গ্রন্থাদিতে বিশেষ স্থান পায় নাই।

এই দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া বৌদ্ধ-জগতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কতকটা বোঝা যায়। শাক্যমুনির প্রথম সাধনের কথা, প্রথম জীবনের কথা লইয়াই সাধারণ বৌদ্ধ মতামত প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল কথাগুলিই বৌদ্ধ-সাহিত্যে বিশেষরূপে স্থান পাইয়াছে, বিশেষরূপে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। গভীর তত্ত্বকথা, উচ্চ সাধনের কথা গভীর অভিজ্ঞতা অতি অল্পই আলোচিত হয়, অতি অল্পই বর্ণিত হয়। তাই শাক্যজীবনের প্রথম কথা, শাক্যমুনির প্রথম সাধনের কথা লইয়াই প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম হইয়াছে। এবং সেই প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা বিচার করিয়া শাক্যমুনিকে যুক্তিবাদী (rationalist) নিরাত্মবাদী, নিরীশ্বরবাদী ইত্যাদি বলা হইয়াছে। বাস্তবিক শাক্যমুনি ত জগৎকে মিথ্যা বলেন নাই—অনিত্য বলিয়া দেখ। মনকে, চিত্তকে মিথ্যা বলেন নাই—অস্থির চঞ্চল বলিয়াছেন। বাহ্যজগৎ অন্তর্জগৎ বিশ্বসংসার সবই বিবর্ত্তনময়, Energy ময় বলিয়াছেন। তাহার অতীত স্থানে, যেখানে বিবর্ত্তন নাই—evolution নাই—সেখানে চিরন্তন, নিত্য-সনাতন, অনন্ত জ্ঞানবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার এই জ্ঞানবস্তু চিদ্‌ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তিনি দেবদেবী বিষ্ণু ব্রহ্মাদি সকলকে বিবর্ত্তনশীল

বলিয়া জানিতেন। কিন্তু ব্রহ্মবাদের বিরোধে কিছুই বলেন নাই। ব্রহ্মদর্শন তাঁহার হইয়াছিল একথা বলিতে হয়। ব্রহ্মকে অনন্ত জ্ঞানবস্তু বলিয়া তিনি জানিয়াছিলেন। গূঢ়তর পরিচয়, আত্মপরিচয় ভগবদ্দর্শন হইয়াছিল কি না, তাহার সবিশেষ উল্লেখ নাই—কিন্তু হয় নাই, সে কথা ও বলা যায় না। অনেক বিষয় এমন আছে যাহার বিষয় তিনি নিরুত্তর থাকিতেন কিম্বা উত্তর দিতে অসম্মত হইতেন এবং যদি দিয়াও থাকেন, তাহা লিপিবদ্ধ হয় নাই। ব্রহ্ম দর্শন, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ রহস্য, বাক্যে বর্ণনা করা যায় না, মনের দ্বারা বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না, সে কথা তিনি জানিতেন।

বুদ্ধদৃষ্টির কথা যে বৌদ্ধসাহিত্যে বর্ণিত আছে, তাহা প্রত্যাদিষ্ট অবস্থা। সে অবস্থায় তিনি উঠিয়াছিলেন এবং সে অবস্থা যাহাতে সকলের হয়, মানব মাত্রেরই হইতে পারে তাহা বার বার বলিতেন। অনন্ত জ্ঞানবস্তুর বিষয়ে যে সকল তত্ত্বকথা আছে তাহাতে বুঝা যায় যে শাক্যমুনি রহস্যবাদী (mystic) ছিলেন, তাঁহাকে ভারতবর্ষের Mystic শ্রেষ্ঠও বলা যাইতে পারে। ভিক্ষা করি নববিধানের আলোকে তাঁহার একান্ত রহস্যবাদ আমাদের কাছে প্রকাশিত হইবে।

Ghosh, Bimal Chandra.

Bauddhadharmma o Nababidhāna =

Ghosh, Bimal Chandra.
Bauddhadharmma o Nababidhana =